চার্লি চ্যাপলিন

মৃণাল সেন

আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক ডি সিকা-র মতে শুধু বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কেন, সিনেমার জন্মের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোনো শিল্পীর নাম তাঁর জানা নেই যাঁর প্রতিভা চ্যাপলিনের প্রতিভাকে ছাপিয়ে উঠেছে।

চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন যে যথেষ্ট বাস্তব-চেতনার অভাব রয়েছে বলেই তিনি যুগকে তাঁর শিল্প-মাধ্যমে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ থাকার দরুন তিনি যুগের একটা চেহারাকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা সত্ত্বেও দেখতে পেলেন না আর একটা দিক, যেখানে মেলে নব জীবনের আস্বাদ। এ-কথা হয়তো ঠিক যে ব্যক্তি সীমানার মধ্যে অনেক সময়েই তিনি নিজেকে আটকে রেখেছেন, কিন্তু তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই সেই সীমানার দেওয়াল ভেঙে গেছে বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে—নতুন পরিবেশে, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পৃথিবীকে দেখেছেন ও বদলেছেন। পরিবর্তনশীল কালের পরিবেশে চেতনার বিভিন্ন স্তরে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অপরাজেয় শিল্পী চ্যার্লি চ্যাপলিন।

চ্যাপলিনের কর্মবহুল জীবনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে এই জিনিসটাই আমি বারবার দেখেছি। দেখেছি যে চ্যার্লি চ্যাপলিনের সমস্ত শিল্পী-জীবনটাই হচ্ছে পৃথিবীতে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার এক বিরাট সংগ্রামের সুসংবদ্ধ ইতিহাস—যে সংগ্রামকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বাস্তবে।

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

মৃণাল সেনের জন্ম ফরিদপুরে, ১৯২৩-এর ১৪ মে। ১৯৫৫-য় প্রথম ছবি, তৃতীয় ছবি বাইশে শ্রাবণ থেকে তাঁর আত্ম-অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া। প্রথম হিন্দি ছবি ভুবন সোম ভারতীয় সিনেমায় একটি মাইল ফলক। ২০০২ সালে তাঁর শেষ ছবি 'আমার ভুবন'। 'পদ্মভূষণ'-এর পাশাপাশি পেয়েছেন সিনেমার সর্বোচ্চ উপাধি 'দাদাসাহেব ফালকে'। টেলিফিল্ম, শর্টফিল্ম এবং ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাদ দিলে তিনি ২৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্র নির্মাণ করেন।

চার্লি চ্যাপলিন

মৃণাল সেন

কবি

চার্লি চ্যাপলিন
মৃণাল সেন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৫

গ্রন্থমালা সম্পাদক
সজল আহমেদ

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৪৩ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
কবি

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রিন্টার্স, ৪৩ কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ভারত

মূল্য : দুইশত টাকা

Charli Chaplin By Mrinal Sen Published By Kobi Prokashani 43 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205
Cell: 01717217335
Price: 200 Taka RS 180 US 12 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-91187-5-6

ভূমিকা

কিছুদিন আগে ইতালির ছবি 'দি বাইসাইকেল থিভস'-এর পরিচালক ভিত্তোরিও ডি সিকাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সিনেমা-শিল্পের উঠ্‌তি দিনের ইতিহাসে আপনার মতে কে সবচেয়ে বড়ো?'

জবাবে ডি সিকা বলেছিলেন, 'চার্লি চ্যাপলিন।'

আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক ডি সিকার মতে শুধু বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কেন, সিনেমার জন্মের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোনো শিল্পীর নাম তাঁর জানা নেই, যাঁর প্রতিভা চ্যাপলিনের প্রতিভাকে ছাপিয়ে উঠেছে।

চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন যে যথেষ্ট বাস্তব-চেতনার অভাব রয়েছে বলেই তিনি যুগকে তাঁর শিল্প-মাধ্যমে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ থাকার দরুন তিনি যুগের একটা চেহারাকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা সত্ত্বেও দেখতে পেলেন না আর একটা দিক, যেখানে মেলে নবজীবনের আস্বাদ। একথা হয়তো ঠিক যে ব্যক্তি সীমানার মধ্যে অনেক সময়েই তিনি নিজেকে আটকে রেখেছেন, কিন্তু তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই সেই সীমানার দেয়াল ভেঙে গেছে বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে—নতুন পরিবেশে, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পৃথিবীকে দেখেছেন ও বদলেছেন। পরিবর্তনশীল কালের পরিবেশে চেতনার বিভিন্ন স্তরে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অপরাজেয় শিল্পী চ্যার্লি চ্যাপলিন।

চ্যাপলিনের কর্মবহুল জীবনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে এই জিনিসটাই আমি বারবার দেখেছি। দেখেছি যে চ্যার্লি চ্যাপলিনের সমস্ত শিল্পী-জীবনটাই হচ্ছে পৃথিবীতে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার এক বিরাট সংগ্রামের সুসংবদ্ধ ইতিহাস—যে সংগ্রামকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বাস্তবে।

৮ মে, ১৯৫৩ **মৃণাল সেন**

এক

১৯১০-১৩ সাল। ইংল্যান্ডের এক নাচগানের দল তখন আমেরিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দলটির নাম কার্‌নো কোম্পানির : লন্ডনের বিখ্যাত ফ্রেড কার্‌নোর নেতৃত্বে গঠিত এক নামজাদা প্রতিষ্ঠান। নাচ-গান, স্কেচ ও প্রধানত প্যান্টোমাইন অর্থাৎ মূক অভিনয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রঙ্গরস পরিবেশন করে ইংল্যান্ডে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সত্ত্বেও আমেরিকায় দলটি বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছিল না। বিদেশে এসে আশানুরূপ আসর জমাতে না পারাটা কিন্তু তাদের এই বিশেষ ধরনের শিল্পকর্মে অক্ষমতাজনিত নয়। কারণ সামগ্রিকভাবে জনস্বীকৃতি না পেলেও আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা তাঁদের শিল্পশিক্ষার যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। সাধারণ্যে দলটি সাদরে গৃহীত হলো না যে-কারণে তা হচ্ছে বিদেশি দর্শকের মানসিক প্রস্তুতির অভাব; ইংল্যান্ডের বহু বছরের মিউজিক হলো কমেডির জাতীয় ট্রাডিশনের সুস্থ পরিবেশ সেখানকার দর্শক সমাজকে এক উন্নততর পর্যায়ে তুলে নিতে পেরেছিল এবং সাধারণ ইংল্যান্ডবাসীর সেই সমঝদারি মন ছিল বলেই জাতীয় ট্রাডিশনে অনুপ্রাণিত ও পুষ্ট কার্‌নো কোম্পানির শিক্ষা, নিষ্ঠা ও প্রয়োগচাতুর্য স্বদেশে এতখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পক্ষান্তরে, আমেরিকার রঙ্গরস পরিবেশনের ক্ষেত্রে জাতীয় ধারার কোনো সুস্পষ্ট বিধান ছিল না বললেই চলে। যা ছিল তা শুধু কোম্পানির অপেক্ষাকৃত উন্নত ও মার্জিত কমেডিগুলো স্থূল রসিকতা ও হৈ-হুল্লোড়ে অভ্যস্ত দর্শকের মনে তেমন রেখাপাত করতে পারল না।

হয়তো আর একটা কারণও ছিল। আমেরিকার সিনেমাশিল্প ঠিক ওই সময়েই দ্রুত প্রসারের মুখে, বিভিন্ন চিত্রপ্রতিষ্ঠানের নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। ফলে, সিনেমা তার অভিনব আঙ্গিকের

কায়দায় ও বিপুল প্রচারযন্ত্রের দাপটে দর্শকের চোখ দিল ঝলসিয়ে, মন দিল ধাঁধিয়ে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সিনেমা আমেরিকার দর্শকচিত্তে এক অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি করে তুলল। অন্য যেকোনো শিল্পের আবেদনের চেয়ে সিনেমার আবেদন নানা কারণে সেই অপরিণত দিনেও হয়ে উঠল অনেক বেশি, অনেক বড়ো। অনেকখানি গ্ল্যামার জড়িয়ে রইল সিনেমাকে ঘিরে।

কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও যে কার্‌নো কোম্পানি সেদিন দর্শকসমাজের এতটা অংশের ওপর রীতিমতো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা নিঃসন্দেহে শিল্পীদের কলানৈপুণ্যেরই পরিচয় দেয়। এবং এই সার্থকতার মূলে ছিল মিউজিক হলের প্রাচীন ঐতিহ্যের সুস্থ সুর, ছিল রঙ্গরসের সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান, ছিল আঙ্গিকের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য। জাতীয় ধারার এই পুঁজি নিয়ে শুধু এক শ্রেণির বিদেশি দর্শকের মন পাওয়াই নয়, কার্‌নো কোম্পানির এই বিশিষ্টতা তৎকালীন সিনেমার অনেক প্রয়োগকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিভিন্ন সময়ে এই ভ্রাম্যমাণ দলটির অনেক শিল্পীর মধ্যে তাঁরা ভবিষ্যৎ সিনেমা-শিল্পীর সম্ভাবনা দেখেছিলেন এবং প্রয়োজনমতো দল ছাড়িয়ে চড়া দামে কিনে এনে তাঁদের বসিয়েছিলেন সিনেমা-স্বর্গের মণিকোঠায়।

এমনি কত বেচাকেনাই না সেদিন হয়েছিল! এই বেচাকেনার হিড়িকের ভেতরে যে-ঘটনাটি সময়ের খাদে তলিয়ে না গিয়ে ছবির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল তা হলো সেদিনের সেই কর্মমুখর, গ্ল্যামার-সিঞ্চিত সিনেমা-স্বর্গ থেকে এক ব্যস্তবাগীশ পরিচালকের একটি ছোট্ট তারবার্তা :

TRY TO GET HOLD OF A BLOKE CALLED CHAPMAN, CAPLIN OR SOMETHING, PLAYING SECOND CIRCUIT.

সেদিন ছিল ১৯১৩ সাল। আর আজ ১৯৫৩ সাল। মাঝখানের এই লম্বা চল্লিশ বছরে কত ঘটনাই না ঘটে গেল, কত ওলটপালট হলো সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক জীবনে। পুরোনো কত কিছু নাকচ হয়ে

নতুন কিছু জন্ম নিল এই অর্থনৈতিক জীবনে! পুরোনো কত কিছু নাকচ হয়ে নতুন কিছু জন্ম নিল এই সময়েরই মধ্যে এবং নতুন সরস পরিবেশে কত কি না বেড়ে উঠল দিনের পর দিন।

আর এই ধসে পড়া ও গড়ে ওঠার কালপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে উঠল সেদিনের সেই নাচগানের দলের নাম না-জানা অভিনেতাটিও! বেড়ে উঠল অভাবনীয়ভাবে, অবিশ্বাস্যভাবে। চল্লিশ বছর আগে যে-ছেলেটি সামান্য এক মাতালের ভূমিকায় গুটি কয়েক দর্শককে মাতিয়ে রেখেছিল, সে আজ মাতিয়ে তুলেছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে, আর খেপিয়ে তুলেছে হিটলারের মন্ত্রশিষ্য ওয়াল স্ট্রিটের ওপরওয়ালাদের।

সেদিনের কার্‌নো কোম্পানির সেই অখ্যাত ছোকরাটি—'চাপম্যান', 'ক্যাপলি' অথবা ওই রকমের আর কেউ—আজ চল্লিশ বছর পরে হয়ে উঠলেন দুনিয়ার এক বিরাট মনীষী—চার্লি চ্যাপলিন। এবং হিটলারের রাজত্বে আইনস্টাইন, টমাস মান প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের ওপর একদিন যে অসভ্য হামলা চলেছিল ঠিক সেই কায়দায়, সেই নিয়মেই আজকের আমেরিকার ওপরওয়ালাদের নির্লজ্জ হামলা চলেছে এই মানুষটির ওপর।

কিন্তু চল্লিশ বছর আগে সেদিন কেউই বুঝতে পারেনি—এমনকি, সেই পরিচালকটিও নয়—যে সেদিনের 'BLOKE' আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হয়ে উঠবে মস্ত একটা বিষয় এবং উপরওয়ালাদের এক উন্মত্ততার মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অচঞ্চল বিশ্বাস নিয়ে মানুষদের দরবারে সে ঘোষণা করবে—I have millions and millions of friends in America and a few enemies—that's all.

দুই

পুরাণে কথিত আছে কোনো মহাপুরুষের জন্মের মুহূর্তে কখনো দারুণ বজ্রপাত হয়, কখনো দৈববাণী হয়, কখনো স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি অথবা ওই ধরনের একটা কিছু ঘটে। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে এসব কিন্তু

নেহাতই আষাঢ়ে গল্প। বলা বাহুল্য চার্লি চ্যাপলিনের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করা আজকের দিনে অচল। তবু এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই জন্মের সময়, যেটা আষাঢ়ে বা ভৌতিক না হলেও ভারি মজার। চলতি ভাষায় একে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে 'কাকতলীয়', যদিও ঘটনাটি মোটেই যেমন-তেমন নয়। অর্থাৎ যে বছরে চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম—পরবর্তী জীবনে যিনি হয়ে দাঁড়ালেন সিনেমা-শিল্পের এক মহারথী—ঠিক সেই ১৮৮৯ সালেই সুদূর আমেরিকায় টমাস আলভা এডিসন সমস্ত দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে ছবিতে করলেন প্রাণসঞ্চার, আবিষ্কার করলেন কিনেটোস্কোপ।

আরও মজার ব্যাপার আছে। 'সমারসেট হাউস'-এর খাতায় ইংল্যান্ডের সমস্ত জন্মেরই রেকর্ড রয়েছে! সমস্ত জন্মের হদিস মেলে সেই খাতায়, শুধু মেলে না—চার্লস চ্যাপলিন নামে কারো ঠিকানা। অথচ এটা ঠিক যে চ্যাপলিনের জন্ম লন্ডন শহরেই, ১৮৮৯ সালের ১৬ এপ্রিল। হয়তো এমন হতে পারে যে চ্যাপলিনের আসল নাম চার্লস চ্যাপলিনই নয়। হয়তো খাতাপত্তরের আসল নামটা অন্য কিছু। অবশ্য এর সঠিক জবাব যাঁর পক্ষে দেওয়া সবচেয়ে সম্ভব, তিনি চ্যাপলিন নিজে। কিন্তু তিনি তাঁর জন্মের টুকিটাকি অথবা নিতান্তই ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি নিয়ে কাউকেই তেমন বিশেষ মাথা ঘামাতে দিতে রাজি এমন মনে হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ষোলো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কোনো এক কুমারী মেয়ে লিলি হার্লি নাম নিয়ে ইংল্যান্ডের ছোট-বড় বিভিন্ন নাচিয়ে দলে নাচগান করে বেড়াচ্ছিলেন এবং ছোট-বড় নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন চুকিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ওই শ্রেণির কোনো দলেরই এক গায়ককে। চার্লি চ্যাপলিন এঁদের সন্তান। বাবা-মা দুজনেরই পেশা ছিল নাচগান; প্রয়োজনমতো, সুবিধেমতো একদল ছেড়ে আরেক দলে চাকরি করেই এঁদের সংসার চলত। সংসারে পুষ্যি বলতে এক চার্লিই ছিল না। তারই সঙ্গে বেড়ে উঠল তার এক বৈমাত্রেয় ভাই সিডনি—চার্লির চেয়ে চার

বছরের বড়ো। সংসার কোনোদিনই সচ্ছল ছিল না। একে তো বাবা-মার সামান্য এলোমেলো আয় দিয়ে মাস কাটানোটাই রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠত; তার ওপর মাঝে মাঝে হিসাবের বাড়তি সামান্য কিছু টাকা হাতে পড়লেই বাবা সঙ্গে সঙ্গে মদ খেয়ে তা উড়িয়ে দিতেন। এই সব কারণে সংসারে অশান্তি এক রকম লেগেই ছিল। সংসারটাকে পুরোপুরি সংসারি করে তোলা আর হচ্ছিল না। ফলে, ছেলেদের দিন কাটতে লাগল নিতান্তই অনাদরে আর অবহেলায়, ছেলেবেলাকার একটা দামি সময় কাটল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, আড্ডা মেরে, আর বাউণ্ডুলেগিরি করে।

পাঁচ বছর বয়সে চার্লির নাট্যজীবনের হাতেখড়ি। মায়ের হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়ল, অভিনয় করা সেদিন তাঁর পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। বাবা তখন মায়ের পরিবর্তে চার্লিকে নিয়ে গেলেন থিয়েটারে, এক রকম ঠেলেই ঢুকিয়ে দিলেন স্টেজের ওপর! চার্লি তো প্রথমে একদল দর্শকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়েই জড়সড়, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কী হলো কে জানে—হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, গলা ফাটিয়ে গান শুরু করে দিল। এতটুকু শিশুর এই সাহস আর তৎপরতা দেখে সবাই মহা খুশি। অডিটোরিয়াম থেকে টাকাপয়সা এসে পড়ল স্টেজের ওপর। আর চার্লি গেয়েই চলল। গানশেষ হতেই ফের নতুন করে গাইতে লাগল চার্লি এবং শেষ পর্যন্ত বাবা যখন ঠেলে ছেলেকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন তখন সে চুপ করল।

এই সময় চ্যাপলিন-পরিবারটি নানান পল্লী-ঘুরে এসে আস্তানা বসিয়েছে দক্ষিণ লন্ডনের কেনিংটন বস্তিতে। নগণ্য পল্লী এই কেনিংটন বস্তি, তার চেয়েও নগণ্য এখানকার মানুষগুলো। আশা, আকাঙ্ক্ষা, হাসি আনন্দ কোনো কিছুরই সন্ধান মেলে না এখানে, চারদিকে যা ছড়িয়ে রয়েছে—পথে, ঘাটে, অন্ধকার খুপরিগুলোতে আর প্রতিটি মানুষের চোখেমুখে—তা শুধু দুঃখ আর দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা। আর এরই মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে লাগল চার্লি। সমাজের নিচের তলায় মানুষের সঙ্গে—আশাহত লাঞ্ছিত মানুষ।

অত্যধিক মদ্যপানের দরুন অল্প বয়সেই বাবার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙে

পড়ল এবং তার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সেন্ট টমাস হাসপাতালে তার মৃত্যু হলো। ছেলেবেলাকার সেই রাতটির কথা চ্যাপলিন বড়ো হয়েও ভুলতে পারেননি। সমস্ত রাত ওই অতটুকু ছেলে দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়, সমস্ত রাত সে হাসপাতালের খোলা জানালার আলোটার দিকে তাকিয়েছিল। যেন একটা প্রচণ্ড ভয় সেদিন ওর বুকের ছোট্ট ধুকধুকিটাকেও চেপে ধরেছিল। বড়ো একা, বড়ো নিঃস্ব সেদিন মনে হয়েছিল নিজেকে। অথচ কেন এই ভয়, কিসের নিঃসঙ্গতা তা সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটি তলিয়ে বুঝতে শেখেনি। শিখেছিল পরে—ছেলেবেলাকার হাজারো বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমস্ত লাঞ্ছিত মানবাত্মার কথাটিকে যেদিন মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বাস্তবিকই তাই। ছেলেবেলাকার অনেক ব্যর্থতা, অনেক জ্বালা, অনেক লাঞ্ছনা ধীরে ধীরে চার্লি চ্যাপলিনের মনে জাগিয়ে তুলল এক চরম ট্র্যাজেডির বোধ, এক বিরাট বেদনার উদ্বেল হয়ে উঠল বঞ্চনার গভীর থেকে। একদিন যে অনুভূতি জন্ম নিয়েছিল ব্যক্তি-জীবনের অসহনীয়তার মধ্য থেকে, ধীরে ধীরে তাই যেন ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে মিশে গেল মহাসমুদ্রের সঙ্গে,—এক সীমাহীন বেদনা-বোধ সমস্ত মানবাত্মার বোবা ভাষাকে মুখর করে তুলল। তাই দেখা যায় বড়ো হয়ে চ্যাপলিন যেখানেই তাঁর ছেলেবেলাকার কথার যতটুকু উল্লেখ করেছেন—বস্তি, মানুষ বা কোনো ঘটনা—সেখানেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা গভীরতর ট্র্যাজেডির ছবি। আমেরিকায় কর্মমুখর কয়েকটা বছর কাটিয়ে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করে যখন চ্যাপলিন স্বদেশে ফিরলেন, তখন কেনিংটন পার্ক প্রসঙ্গে তিনি তার ডায়েরিতে লিখলেন—'How depressing to me are all parks! The loneliness of them, one never goes to a park unless one is lonesome. And lonesomeness is sad. The symbol of sadness, that's a park.

The symbol of sadness, that's a park. ঠিক এমনি করেই নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিককে ঘিরে সব কিছুতেই চ্যাপলিন দেখেছেন

ব্যক্তির সীমানা ডিঙিয়ে, দেখেছেন গভীরতর অনুভূতি দিয়ে। বস্তি, পথ, ঘাট, মানুষ, ঘটনা—সবই যেন সেই অনুভূতির সেই বিরাট বঞ্চনারই প্রতীক। অনেকদিন পরে কেনিংটন পার্কে দাঁড়াতেই তাঁর মনে পড়ে গেল কত কথা, মনে পড়ল সেই অপরিণত বয়সের প্রথম প্রেমের কথা। চ্যাপলিন তার ডায়েরিতে লিখলেন—'It was here my first appointment with Hetty. How I was dolled up in my little tight-fitting frock coat, hat and cane! I was quite the dude as I watched every streetcar until four o'clock, waiting for Hetty to step off, smiling as she saw me waiting. I get out and stand there for a few moments at Kennington Gate. My taxi driver thinks I am mad. But I am forgetting the taxi driver, I am seeing a lad of nineteen, dressed to the pink, with fluttering heart, waiting for the moment of the day when he and happiness walked along the road. The road is so alluring now. It beckons for another walk and as I hear a streetcar approaching I turn eagerly, for a moment, expecting to see the same trim Hetty step off, smiling. The car stops. A couple of men get out. An old woman, Some children. But no Hetty. Hetty is gone. So is the lad with the frock coat and cane.'*

সবটাই চ্যাপলিনের প্রথম বয়সের প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে লেখা। অথচ বেদনাবোধটি নিতান্ত ব্যক্তিগত হয়েও যেন ব্যক্তির উর্ধ্বে এক বৃহত্তর অনুভূতির আস্বাদ মেলে প্রতিটি কথায়, প্রতিটি চিন্তায়। এবং নিঃসন্দেহে এই অনুভূতিই চ্যাপলিনের শিল্পসৃষ্টির উৎস।

অর্থাৎ চ্যাপলিন তার সৃষ্টির মূল উপাদান কুড়িয়ে পেয়েছেন তার

---

* ১৯২১ সালে প্রচুর সম্মানে ভূষিত হয়ে চ্যাপলিন যখন কয়েক মাসের জন্য স্বদেশে ফিরছিলেন তখন খবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন যে দুবছর আগে তার প্রথম বয়সের প্রেমিকা হেটিকেলি মারা গেছে।

ছেলেবেলাকার দুঃসহ জীবনযাত্রার ভেতর থেকে। এখানেই তিনি চিনেছেন দুঃখকে, চিনেছেন দারিদ্র্যকে, রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয় ঘটেছে এখানে। আবার এই শক্ত, কঠিন, লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে খাঁটি সোনার মতো সাচ্চা প্রাণের হদিস তিনি পেয়েছেন এই পোড়-খাওয়া, শিরদাঁড়া ভাঙা মানুষের ভেতরেই। এরই মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন এক গভীর জীবন-বোধ, পেয়েছেন সৃষ্টির প্রেরণা এবং পরবর্তী জীবনে চ্যাপলিন তার শিল্পসৃষ্টির এই উৎসের কথা, এই বেদনা-বোধের কথা বলেছেন অতি সহজ করে, অনাড়ম্বর ভাষায়—'I have known humiliation. And humiliation is a thing you cannot forget.'

বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চ্যাপলিন-পরিবারের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ল, সংসার একরকম অচল হয়ে দাঁড়াল। মার শরীর দিন দিন এমন ভেঙে পড়তে লাগল যে নাচগান করে অর্থোপার্জন করার উপায়ও আর রইল না। অথচ কিছু না করলেও নয়। মা শুরু করলেন সেলাইয়ের কাজ, আর ছেলেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ বেচে, কাগজ আর দেশলাইয়ের খেলনা বানিয়ে সংসারটাকে কোনোরকমে জিইয়ে রাখছিল। কোনোদিন খেত আধপেটা, কোনোদিন বা একেবারে না খেয়েই কাটিয়ে দিতে হতো। এমনকি ওই বয়সে চার্লিকে কখনো কখনো রাস্তায় রাস্তায় নেচেগেয়েও পয়সা কামাতে হয়েছে এবং মাঝে মাঝে ছোটখাটো পেশাদারি দলের নাচার চাকরি করতে হয়েছে।

এমনি সময়েই একদিন বাড়ি ফিরে চার্লি দেখে যে মা নেই। প্রতিবেশীরা জানাল যে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে তার মাকে কোথায় নিয়ে গেছে। সেই দিনটায়, বিশেষ করে সেই মুহূর্তে সেদিনকার চার্লির ভেতরটা আরেকবার এক প্রচণ্ড নাড়া খেল। ছেলেবেলাকার দুঃসহ জীবনযাত্রার আর একটি দৃষ্টান্ত।

আস্তানা হারিয়ে পারিবারিক শেষ বন্ধনটুকুকেও চুকিয়ে চার্লি আর তার ভাই সিডনি ঘুরে বেড়াতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। পার্কে আর বাজারে ঘুমিয়ে, না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, ভবঘুরে জীবনই তাদের

বেছে নিতে হলো। বাবা-মা দুজনেই গাইয়ে ছিলেন বলে যে গুণটি সহজেই চার্লি আয়ত্ত করতে পেরেছিল। তাই নিয়েই সে তার ভাইদের পেটের তাগিদকে মেটাতে বদ্ধপরিকর হলো। যখন যেমন দরকার, তেমন অভিনয়, করতে হলো তাকে; নাচতে হলো, গাইতে হলো, সং সাজতে হলো। এমনকি, এক এক সময় মূক অভিনয় করতে গিয়ে কুকুর, বেড়াল পর্যন্ত তাকে সাজতে হলো। মাঝে মাঝে যখন আয়ের এই সামান্য পথটিও বন্ধ হয়ে যেত, তখন আর কষ্টের সীমা থাকত না। খড়কুটোর মতো ভেসে বেড়াতে হতো এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে। এটা-ওটা করে, নাপিতের দোকানে সামান্য মাইনের চাকরি পর্যন্ত করে চলতে হয়েছে এই সময়। এক দিনের জন্য একটি কাচের কারখানায় মজুরের কাজ করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফিরে এসেছে এমনও শোনা যায়। এমনি নানা বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে গিয়ে কোনো একসময় অনাথ আশ্রয়ে দুই ভাইকে নিতে হলো, এবং তার কিছুদিন পরেই ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করে মা ফিরে এলেন ছেলেদের কাছে, আবার নতুন করে আস্তানা বসালেন ওই বস্তিতেই।

এই সময়ে পরিবারের অবস্থার সামান্য সুরাহা হয়েছিল এমন শোনা যায়। মা যথারীতি সেলাইয়ে কাজ করে কিছু উপার্জন করতে লাগলেন। আর চার্লি সাত বছর বয়সে এক অখ্যাত ভ্রাম্যমাণ মিউজিক দলে নাম লেখাল। বছর দেড়েক সেই দলের হয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে এল চার্লি, এবং তখন থেকে দু'বছরের জন্যে চার্লিকে তার মা ভর্তি করিয়ে দিলেন কাছাকাছি একটি স্কুলে। চ্যাপলিনের জীবনে কেতাবি শিক্ষার দৌড় ওই পর্যন্তই—ওই দু'বছরের। সিডনি অবশ্য সেই সময়ে পরিবারের বাইরে জাহাজির কাজ শিখতে ব্যস্ত।

চ্যাপলিনের মতে তার অভিনয়-জীবনের হাতেখড়ি হয়েছে তার মায়ের কাছে। ওর নাকি অসাধারণ অনুকরণ ক্ষমতা ছিল, আর ছিল সূক্ষ্ম দৃষ্টি। এমনকি রাস্তার অচেনা লোকের পোশাক পরিচ্ছদ, চেহারা, হাবভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করে বাড়িতে বউ অথবা আর কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কি না লোকটির তাও নাকি চ্যাপলিনের মা বলে দিতে পারতেন।

তিনি তার মায়ের সম্পর্কে বলেছেন, 'She was the most outstanding mimic I ever saw.'

কেনিংটন বস্তির সদর রাস্তায় যখন অগুনতি মানুষের ভিড় দেখা দিত—বিস্তর মানুষ, বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র তাদের চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, চেহারা, বিচিত্র তাদের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি—তখন প্রায়ই দেখা যেত রাস্তার ধারে ছোট ডেরাটির জানালার পাশে মা তার ছোট চার্লিকে সামনে দাঁড় করিয়ে হাতপা নেড়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে, নিখুঁত অভিনয় করে চলেছেন রাস্তার ওই মানুষদের। চার্লির কাছে এ এক ভারি মজার খেলা—দেখা ও শোনা। সেদিনের সেই নিষ্ঠাবান শিক্ষানবিশ চার্লি পরবর্তী জীবনে আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়েও তার সেই ছেলেবেলাকার শিক্ষার কথা এতটুকুও ভুলতে পারেননি। শুধু বাহ্যিক অনুকরণই নয়, চ্যাপলিনের বিশ্বাস যে মানবচরিত্রকে খুঁটিয়ে বোঝার যে-দাবি তিনি করে থাকেন তার মূলেও রয়েছে সে-দিনের সেই শিক্ষা।

ইতিমধ্যে সিডনি আফ্রিকা থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ফিরে এল মা আর ভাইয়ের কাছে। মা তো প্রথমে ছেলেকে চিনতেই পারেন না। যাহোক, সিডনি ফিরতেই সে মন দিল ব্যবসায়ে, সংসার পালন এক রকম তাকেই করতে হলো,—আর চার্লি পাকাপাকিভাবে নাচগানকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করল।

চার্লির এই প্রথম যুগের নাট্যজীবন নিয়ে কিছু কিছু মজার গল্পের প্রচলন আছে। কোনো একটি দল যখন চার্লিকে 'শার্লক হোমস্'-এর বিলির ভূমিকায় মনোনীত করল তখন তার বয়স মাত্র এগারো বছর। চার্লিকে যখন তার নাট্যাংশটুকু লিখে দেওয়া হলো তখন সে অমনোনীত হওয়ার ভয়ে পরিচালককে এই কথাটি জানাতে সাহস পেল না যে লিখতে বা পড়তে কিছুই সে জানে না। চুপচাপ লেখাটিকে সে বাড়িতে নিয়ে এল। বাড়িতে সমস্ত রাত মা তাকে পাঠটি মুখস্থ করিয়ে ছাড়লেন এবং বলা বাহুল্য, সেই ভূমিকায় চার্লি পরিচালককে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল।

আর একদিন কোনো এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সপ্তম এডওয়ার্ড, রানী আলেকজান্দ্রা ও গ্রিসের রাজা। শিল্পীদের সবাইকে আগেভাগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যেন রাজারাজড়ার আসনের দিকে না তাকায়। তাকালেই সর্বনাশ! অর্থাৎ তা রাজাদের প্রতি চরম অসম্মান প্রদর্শনের শামিল। কিন্তু এত সাবধানতা, এত চোখ রাঙানি সত্ত্বেও চার্লি কৌতুকবশে কখন অভিনয়ের ফাঁকে টুক করে তাকিয়ে ফেলেছিল ওই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রমাদ গুনল, না জানি কী হয়! সমস্ত অডিটোরিয়ামটা যেন থমথমিয়ে উঠল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে অডিটোরিয়ামের অস্বস্তিকর গুমটের অবসান ঘটিয়ে হেসে উঠলেন সপ্তম এডওয়ার্ড। পরে অবশ্য নাটকের কর্তৃপক্ষের কাছে চার্লি রীতিমতো ধমকানি খেয়েছিল।

এইভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে চার্লি একদিন এসে দাঁড়াল লন্ডনের বিখ্যাত কার্‌নো কোম্পানির দরজায়। সিডনি ইতিমধ্যে তার ব্যবসায়ে এঁটে উঠতে না পেরে জুটেছে ফ্রেড কার্‌নোর সঙ্গে এবং সিডনির অনুরোধে কার্‌নো তার ছোট ভাই চার্লিকে ছোটখাটো সুযোগ দিতে রাজি হলেন।

তিন

চার্লি চ্যাপলিনের শিল্পীজীবনে কার্‌নো কোম্পানির প্রাধান্য অনস্বীকার্য এবং এ কথা বহুবার চ্যাপলিন নিজ মুখে বলেছেন। কার্‌নো কোম্পানির রঙ্গরসের মার্জিত আঙ্গিক চ্যাপলিনকে প্রথম থেকেই মুগ্ধ করেছে এবং পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন ঘটনার ভেতরে তার ওই যুগের একাধিক স্কেচের টুকিটাকি সুযোগ বুঝে সুবিধেমতো প্রয়োগ করেছেন। তা ছাড়া, কার্‌নো কোম্পানির হয়ে পশ্চিম ইউরোপের নানা জায়গা ঘুরে বিভিন্ন দেশের কমেডি বৈশিষ্ট্য ও ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও চ্যাপলিনের জীবনের কম বড়ো ঘটনা নয়। এই সব এবং বিশেষ করে প্যারিসে বিখ্যাত ফরাসি কৌতুকাভিনেতা ম্যাকস লিন্ডারের নির্বাক ছবি চ্যাপলিনের শিল্পীমনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তা

স্বীকার করতে তিনি একটুও দ্বিধান্বিত নন।

১৯১০-১৩ সালের মধ্যে কার্‌নো কোম্পানির হয়ে দু'দুবার চ্যাপলিন আমেরিকায় যান এবং সেখানে নিউইয়র্কের কোনো থিয়েটারে ওই ভ্রাম্যমাণ দলটির 'A Night in English Music Hall'—নামে এক কমেডিতে মাতালের ভূমিকায় নেমে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যে চিত্রপরিচালক সেই মাতাল ছোকরাটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তিনি বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক ডি ডবলিউ গ্রিফিস-এর কৃতী ছাত্র ম্যাক-সেনেট—আমেরিকার সিনেমা কমেডির দিকপাল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

সেই যুগে সিনেমায় হাস্যরস সৃষ্টি করার নামে প্রধানত যা হতো তা ছিল ভূরি ভূরি উদ্ভট আজগুবি ঘটনার অত্যন্ত স্থূল পরিবেশন। সংযমের কোনো বালাই ছিল না সেখানে। না ঘটনা-সংস্থাপনে, না চরিত্র-সৃষ্টিতে। খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুতেই আতিশয্যতা রীতিমতো একটা নীতিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার উপর সেই সময়কার হাস্যরসের ছবিগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল সাধারণত এক রিল। স্বভাবতই সেই কয়েক মিনিট সময়ে আতিশয্য-পীড়িত উদ্ভট ঘটনাবলির স্থূল পরিবেশন দর্শককে সাময়িকভাবে হাসাতে সক্ষম হলেও তার মনে আশানুরূপ দাগ কাটতে পারত না। সর্বকালে সর্বদেশের শিল্পীসৃষ্টি তখনই হয়ে ওঠে যখন চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশকে দর্শক তার বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নিতে পারে, এবং তারই ভিত্তিতে যখন চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে দর্শক একটা একাত্মতা বোধ করে। সে যুগের হাস্যরসের ছবিগুলোতেও অভাব ছিল সেই আসল বস্তুটিরই, যা একমাত্র দর্শকের ভেতরে বাঞ্ছিত ইমোশান আনতে সক্ষম। প্রচণ্ড অভাব ছিল মানবিক বোধের।

তবুও যথেষ্ট মানসিক ও বুদ্ধির খোরাক না থাকা সত্ত্বেও সে যুগের হাস্যরসের ছবিগুলো সাধারণ মানুষের কাছে মোটামুটিভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল তার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল এবং সেই কৃতিত্বের দাবি—তা যতখানিই হোক না কেন সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা নিশ্চয়ই করতে

পারেন। প্রথমত, সেই সময়কার ছবি নির্বাক হওয়ার দরুন প্যান্টোমাইমের পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল ছিল, এবং কমেডির ক্ষেত্রে প্যান্টোমাইমের আর্ট যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এ কথা অনস্বীকার্য। আজকের সবাক ছবির দিনে হাসির গল্পে কেউ যদি মাথায় প্রচণ্ড ঠোক্কর খায় তো ঠোক্করের শব্দ ছাড়া সেও উঃ আঃ বা ওই জাতীয় কোনো না কোনো শব্দ করে বা চেঁচিয়ে উঠবে, অথবা বড়জোর একটা দার্শনিক নিষ্ক্রিয়তার ভাব দেখিযে বা সমাধিপ্রাপ্তির ঢঙে চোখ বন্ধ করে একবার আন্দাজ করে নিতে চেষ্টা করবে ঠোক্করের ওজনটা। ওই পর্যন্তই। কিন্তু সেই যুগে—নির্বাক ছবির দিনে—ঠোক্কর-খাওয়া লোকটির গতিবিধির পরিধি বেড়ে যেত অনেকখানি। হয়তো সে ঠোক্কর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাঠের মতো শক্ত হয়ে যেত, ওই বেয়াড়া অবস্থাতেই হয়তো পিছিয়ে যেত দুপা, তারপর ধীরে ধীরে এক সময়ে সটান পড়ে যেত মেঝের ওপর, যেন সমস্ত শরীরটা দিয়েই একটা চড় কষিয়ে দিল মেঝেটাকে। অর্থাৎ সে যুগে মস্ত সুযোগ ছিল অঙ্গভঙ্গির, শারীরিক কসরতের অনেক বেশি সুবিধে ছিল। এবং প্যান্টোমাইমের আর্ট যে যত বেশি রপ্ত করতে পারত সে তত নিপুণভাবে, তত মৌলিক ঢঙে, তত ছন্দোময়তার সঙ্গে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারত বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে। আজকের দিনে ছবিতে প্যান্টোমাইমের আর্ট যে নিষিদ্ধ এমন নয়, সবাক ছবিতে যে তার বিকাশ ঘটতে পারে না তা নয়, কিন্তু যেদিন থেকে সচল ছবিতে ভাষা জুড়ল, সেদিন থেকে দেখা গেল ভাষাটাই যেন ধীরে ধীরে প্রাধান্য পেতে লাগল, হাস্যরসটুকু যেন কথা সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়ে চলল। শব্দের আপাত প্রভাবে স্বভাবতই সবাক ছবির শুরু থেকে প্যান্টোমাইম সুষ্ঠু ও সংমিশ্রণে সিনেমা-কমেডি যেখানে অধিকতর বলিষ্ঠ আর্টফর্ম হয়ে উঠতে পারত, সেখানে সবাক ছবিতে হাস্যরসের মান সাধারণভাবে অনেকখানি নেমে গেল।

কিন্তু সেদিনের নির্বাক ছবির আঙ্গিকের সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ শব্দ না থাকাটাই যেন হাস্যরসের শিল্পীদের চূড়ান্ত বিকাশের সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার ওপর শিল্পীদের নিজ নিজ শিল্পপ্রতিভা ও মৌলিকতার

গুণে রসসৃষ্টির মান উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে। আমেরিকার তথা দুনিয়ার সিনেমা-কমেডির সেই স্বর্ণযুগের যাঁরা পুরোধা, ম্যাক সেনেট তাঁদেরই একজন।

স্নানরতা প্রমীলার রাজ্যে একদঙ্গল বেঁটে মোটো বা ওই জাতীয় কিম্ভূতকিমাকার চেহারা-বিশিষ্ট পুলিশ অথবা কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকদের ছেড়ে দিয়ে ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়ির মধ্য দিয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের অনাসৃষ্টি গড়ে তোলা, কিংবা ওই রকমের পেটে খিল ধরিয়ে দেওয়ার মতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করাটাই ছিল সে-যুগের ম্যাক সেনেটের বৈশিষ্ট্য। আগে থেকেই কোনো চিত্রনাট্যের বালাই ছিল না সেনেটের! বড়জোর ছোট্ট এক টুকরো কাগজে গল্পাংশের কাঠামোর কিছুটা এঁকে নিয়ে, দলবল নিয়ে তিনি বসে যেতেন ক্যামেরাকে ঘিরে। ক্যামেরার সামনে ঘটনাকে একবার চালু করে দিলেই হলো, বাকিটুকু অর্থাৎ সবটুকুই দলীয় শিল্পীরা পরিচালক-নির্ধারিত নিয়ম মেনে এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে দিতেন যা হয়ে উঠত সে-যুগের হাস্যরসের সেরা কীর্তি। তদুপরি, ফিল্ম কম খরচ হবে মনে রেখে ক্যামেরার গতি কমিয়ে দেওয়ার দরুন ফল যা দাঁড়াল তাই ক্রমে হয়ে উঠল ম্যাক সেনেটের শিল্প সৃষ্টির আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আজ যেমন ক্যামেরা ও প্রোজেক্টরের গতিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেকেন্ডে চব্বিশটি ফ্রেম হিসাবে, নির্বাক যুগে তা চব্বিশে বাঁধা না থেকে ছিল ষোলোতে। তখন সেকেন্ডে ষোলো ফ্রেম এই হিসাবে ক্যামেরা চালিয়ে ছবি দেখানোর সময় প্রোজেক্টরের গতি যদি একই (অর্থাৎ সেকেন্ডে ষোলো ফ্রেম হিসাবে) রাখা হতো তাহলে পর্দায় নিক্ষিপ্ত ছবি ও বাস্তব দৃশ্যের মধ্যে কোনো ফারাক থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রোজেক্টরের গতি সমান রেখেই যদি ক্যামেরার গতি বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া যেত তা পর্দায় নিক্ষিপ্ত ছবির মধ্যে পাওয়া যেত একটা অস্বাভাবিকতা। নেহাতই ব্যয়সঙ্কোচের মন নিয়ে ম্যাক সেনেটের ক্যামেরাম্যান যেদিন ক্যামেরার গতিকে দিলেন রুখে—ষোলোর জায়গায় বারো—ছবি চালানোর সময় সেদিন দেখা গেল পর্দায় লোকগুলো যেন ছুটছে অস্বাভাবিকভাবে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো,

হাঁটছেও সেই রকম—টুকটুক করে যেন একটা অস্বাভাবিক রকমের বাড়তি গতি পেয়েছে তারা। জিনিসটা চলচ্চিত্রের বিজ্ঞানে একটা নতুন কিছু না হলেও ম্যাক সেনেট গতির এই অস্বাভাবিকতাকে প্রয়োগ করলেন তাঁর শিল্পীসৃষ্টির আঙ্গিকে। কখনো গোটা ছবিটা, কখনো বা বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো তিনি তুললেন ক্যামেরার গতি কমিয়ে। ফলে পর্দায় এক বেয়াড়া ধরনের গতির আতিশয্যে ঘটনার অরাজকতা আরো অরাজক হয়ে উঠল। স্নানরতা সুন্দরী, বিশালদেহী কোতেয়াল আর কেতাদুরস্ত ভদ্রালোক সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল এক উন্মত্ত বিশৃঙ্খলায়। সঙ্গে সঙ্গে হাসির দমকে ফেটে পড়ল সে যুগের দর্শক, অডিটোরিয়ামের চেয়ারগুলো ঠকঠকিয়ে উঠল বিশৃঙ্খল নাড়া থেকে।

সিনেমা-কমেডির আঙ্গিকের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই চার্লি চ্যাপলিন এসে জুটলেন ম্যাক সেনেটের দলে। নানা সন্দেহ, নানা সংশয় কাটিয়ে কার্‌নো কোম্পানি থেকে নাম কাটিয়ে সপ্তাহে একশ পঁচিশ ডলার হিসাবে চ্যাপলিন এক বছরের চুক্তি করলেন কিস্টোন স্টুডিওর সঙ্গে—১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে।

চ্যাপলিনের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বছর। ম্যাক সেনেট কিন্তু ভেবেছিলেন অন্য রকম। তিনি চ্যাপলিনকে এর আগে একবার মাত্র দেখেছিলেন এবং তাও দেখেছিলেন দূর থেকে এক বয়স্ক মাতালের ভূমিকায়। মাতালটির অভিনয় সেনেটের ভালো লেগেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভেবেছিলেন লোকটা নিশ্চয়ই বয়স্ক। তাই সত্যিকারের চ্যাপলিনকে চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে ম্যাক সেনেট বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিল; পরবর্তী জীবনে এই সময়ের কথা তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—'It was weeks before charlie put over anything real. He tried all sorts of make-up–one of them I remember was a fat man and there were all about equally flat. As a matter of fact, for some time I felt more than a little uneasy as to whether my find was a very fortunate one!'

চ্যাপলিনের নিজেরও কিছুদিন কাটল অত্যন্ত অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে। একে তো স্টুডিওর হালচাল তিনি জানেন না,—সবই তার কাছে নতুন,—তার ওপর হঠাৎ এক অজ্ঞাত-কুলশীলকে মালিকের খেয়ালমাফিক চড়া দামে কিনে আনা হয়েছে বলে স্টুডিওর পুরোনো শিল্পীরা চ্যাপলিনকে বেশ খানিকটা ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগলেন। নায়িকা মারলে নরমান্ড তো একরকম কথাই বলতেন না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চ্যাপলিনকে ডাকতেন 'The Englisher so-and-so' বলে। অন্য ছোটবড় শিল্পীরাও বড়ো একটা আমল দিতেন না তাকে। শোনা যায় প্রথম ছবিতে এই 'package missent'-এর সঙ্গে অভিনয় করতে মারলে নরমান্ড আপত্তিও জানিয়েছিলেন।

কিন্তু কিছুদিন পরেই সিনেমার কলাকৌশল সম্পূর্ণ অবোধ্য থাকার দরুন নানা অসুবিধের সম্মুখীন হয়েও চ্যাপলিন স্বকীয় শিল্পপ্রতিভার জোরে প্রথম ছবি MAKING A LIVING-এ দর্শক মনে দাগ কেটে যেতে সমর্থ হলেন। এই ছবির অভিনয় সম্পর্কে একজন বিখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করলেন, "The clever player who takes the part of the sharper is a comedian of the first water." মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে তখন পর্যন্ত অনেকেই চ্যাপলিনের নাম ঠিক জানতেন না। কেউ বলতেন চাপম্যান, কেউ বলতেন চ্যাটলিন, কেউ বা অন্য কোনো নামে তাকে অভিহিত করতেন। দর্শক-মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করা সত্ত্বেও নাম না জানার কারণ অবশ্য একটা ছিল,—সে-যুগে ছবির শুরুতে অভিনেতাদের নামের তালিকা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না! কিন্তু এই প্রথম ছবি এবং পরবর্তী কয়েকটি সপ্তাহে আরো কয়েকটি ছবির মুক্তি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই চ্যাপলিনের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি।

চার

ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে যেমন মহাকবি শেকস্‌পীয়রের 'হ্যামলেট' অর্থহীন, ঢিলে ট্রাউজার, আঁটসাঁট কোট, বাউলার টুপি, ছড়ি

আর বিটকেল-ডাবি-জুতো-বিশিষ্ট সেই বিশ্ববিখ্যাত অঙ্গ-সাজটি ছেড়ে ভবঘুরে চ্যার্লির কল্পনা করাটাও ঠিক তেমনি অসম্ভব। চ্যাপলিনের শিল্পসৃষ্টির সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্য আর স্বকীয়তার এটিও একটা মস্ত বড়ো দিক। চ্যাপলিন সমস্ত জীবনদর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এর মধ্যে দিয়েও। অথচ শিল্পীর জীবনদর্শনের এই যে এত বড়ো একটা মাধ্যম তার আবির্ভাব কিন্তু ঘটেছিল নিছক একটা অকিঞ্চিৎকর আকস্মিক পরিস্থিতির ভেতরে।

সেই যুগে কোথাও কোনো কুচকাওয়াজ হচ্ছে, অথবা কোনো বড়ো গোছের খেলাধুলার আয়োজন হয়েছে, কিংবা ওই জাতীয় কোনো জনসমাবেশ ঘটেছে—এই রকম কোনো খবর পেলেই ম্যাক সেনেট সঙ্গে সঙ্গে তার ক্যামেরাম্যান, কলাকুশলী এবং শিল্পীদের কাউকে পাঠিয়ে দিতেন সেখানে, এবং উপরোক্ত আয়োজনটির সামনাসামনি ছেড়ে দিতেন তাঁর শিল্পীদের। ক্যামেরাম্যানও যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে বাগিয়ে নিতেন তাঁর কাজ, যেদিক থেকে সুবিধে পেতেন তুলে নিতেন ছবি। ঠিক এই রকমই একটি আয়োজনের কথা একদিন ম্যাক্ সেনেটের কানে এলো : লস অ্যাঞ্জেলেস-এর কাছে পিঠে ভেনিস নামে ছোট একটি গ্রামে নাকি কাচ্চা-বাচ্চাদের এক সাইকেল রেস হচ্ছে। কালবিলম্ব না করে সেনেট ক্যামেরাসমেত সেখানে পাঠিয়ে দিলেন তাঁরই অধীন পরিচালক ল্যেরম্যান ও নবনিযুক্ত চ্যাপলিনকে। জানিয়ে দেওয়া হলো, যেমন-তেমন একটা বিদঘুটে পোশাক পরে চ্যাপলিনকে এবার অভিনয় করতে হবে। বিশেষ মাথা না ঘামিয়েই সামনাসামনি যা পেলেন চ্যাপলিন তাই পরে ফেললেন। এক মেদবহুল সহকর্মীর ট্রাউজারের মধ্যে গলিয়ে দিলেন বেঁটে খাটো দেহটাকে, জনৈক বন্ধুর একটা কোট চাপালেন আঁটসাঁট করে, আর একজনের জাঁদরেল বুট জোড়া পা থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়বে এই ভয়ে পরলেন উল্টো করে—ডান পায়েরটা বাঁ পায়ে আর বাঁয়েরটা ডান পায়ে। তার ওপর হাতে একটি বাঁশের ছড়ি ঝুলিয়ে ও নাকের নিচে টুথব্রাশের মতো একজোড়া গোঁফ ছড়িয়ে চ্যাপলিন এক অদ্ভুত সঙ সেজে নেমে পড়লেন রাস্তায়। তারপর

দৌড়ঝাঁপ, ছোটাছুটি যেমন ঘটে থাকে ঘটল সেই রকম। পৌনে এক ঘণ্টা ধরে ছবি তোলা হলো, যদিও পর্দায় দেখানো হলো অনেকখানি ছেঁটে কেটে—আনুমানিক পাঁচশ ফিটের ছবি। ছবিটির—যা তাঁর সিনেমায়-জীবনের দ্বিতীয় ছবি-নামকরণ হলো DKI AUTO RACES AT VEVICE; এবং এই ছবিতেই চ্যাপলিন আত্মপ্রকাশ করলেন যে-সাজে, সেই সাজটি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে উঠল বিশ্ববিখ্যাত। সেদিন এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সবার অজ্ঞাতে যে সংয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল—ধীরে ধীরে কাহিনী, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের উত্তরোত্তর বিকাশের ভেতর দিয়ে তারই পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু কিছু পরিবর্তন আসতে লাগল;—বিংশ শতাব্দীর এক অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে উঠল চার্লি—এক অদ্ভুত সাজে খুদে ভবঘুরে সাজে—A fallen aristocrat at grips with poverty. ১৯১৪ সালে এই বিশেষ সাজটির আবির্ভাব, এবং সেই থেকে টুকটুক করে হেঁটেই চলেছেন চার্লি চ্যাপলিন নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে,—বিভিন্ন কাহিনীতে, বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। একটানা এমনই চলল ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৪০ সালে THE GREAT DICTATOR-এ আংশিক ও ১৯৪৭ সালে M. VERDOUX-এ সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল ওই পোশাকটির। চ্যাপলিনের শেষ ছবি LIMELIGHT-এও এই সাজটি অনুপস্থিত। কে জানে ভবিষ্যতের ছবিতে এতদিনের এই খুদে ভবঘুরের আর দর্শন মিলবে কি না! মিলুক আর নাই মিলুক, গত একটা যুগ চ্যাপলিন ওই লোকটির মারফত যে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের ও মননশীলতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন সেই জন্য 'খুদে ভবঘুরেটি' সিনেমা-শিল্পে চিরকালীন হয়ে রইল।

চ্যাপলিন তাঁর এই পোশাক সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন,—That costume helps me to express my conception of the average man, of almost any man, of myself, the derdy is striving for dignity, The moustache is vanity, The tightly

buttoned coat and the stick and his whole manner are a gesture towards gallantry and dash and front! He is trying to meet the world bravely to put up a bluff and he knows that too. he knows it so well that he can laugh at himself and pity himself a little.'

বিত্তহীন, ব্যর্থপ্রাণ, ভবঘুরে! এ-যুগের ইতিহাসে চার্লি চ্যাপলিনের এ এক মহার্ঘ্য অবদান। চ্যাপলিন একে দেখেছেন কেনিংটনের বস্তিতে, অলিতে-গলিতে, অন্ধকার খুপরিগুলোতে, ধুঁকেধুঁকে-মরা প্রতিটি মানুষের চোখে-মুখে? একে তিনি দেখেছেন দারিদ্র্যের মধ্যে, বঞ্চনার গভীরে, দেখেছেন আজকের দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অসহনীয় জীবনযাত্রার ভেতরে। এর প্রতিটি অনুভূতি প্রতিটি অনুকরণ, এর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিটি ইঙ্গিত চ্যাপলিন খুঁজে পেয়েছেন বাস্তবজীবনের তলা থেকে এবং তা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এক আজব কায়দায়, আজব ঢঙে।

অবশ্য চ্যাপলিনের দ্বিতীয় ছবি KID AUTO RACES AT VENICE-এ বিশিষ্ট সাজটির জন্মের শুরু থেকেই যে তাঁর জীবনদর্শনের এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল তা মোটেই নয়। সাজটিকে তখন সাজানো হয়েছিল নেহাতই হাসানোর মেজাজ নিয়ে। তার চেয়ে বেশি কিছু কর্মকর্তাদের বা চ্যাপলিনের মাথায় ছিল না। বলা বাহুল্য ছবি দেখে সে-যুগের দর্শক প্রাণ খুলে হেসেছিলেন, কিন্তু তার ভেতরে চিন্তার বা গুরুগম্ভীর কোনো বিষয়ের খোরাক অথবা বিদ্রূপের কোনো আমেজ পাওয়া সম্ভব হয়নি। শুধু হাসি, নেহাতই হাসি কিন্তু সেই ছবি এবং আগেকার ছবিটি ও পরবর্তী আরো কয়েকখানা ছবি বাজারে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই চ্যাপলিন যে সে-যুগের অনেকের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তার মূল কারণ ছিল প্যান্টোমাইমের ওপর তাঁর অশেষ দক্ষতা। এই বিশিষ্ট আর্টফর্মের ওপর দক্ষতা ছিল বলেই কোনো গভীর আবেগে অনুপ্রাণিত না হলেও চ্যাপলিনের তখনকার ছবিগুলো এক উন্নততর হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। (সে-যুগের দর্শকের পক্ষে যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি চ্যাপলিন নিজেও কিন্তু সেদিন সেই অদ্ভুত সঙটিকে

কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার কথা এতটুকু ভাবেননি।) ভেবেছিলেন হয়তো এইটুকুই যে, দর্শক যখন একবার সেই সঙ দেখে হেসেছে তো হাসুক না কেন আরো কিছুদিন। হয়তো এটা ভেবেছিলেন বলেই আঁকড়ে ধরেছিলেন ওই সাজটিকে; এবং ধীরে ধীরে চিন্তার উত্তরোত্তর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনও এনেছিলেন একটু একটু করে। এমনি করে পর পর ছোট ছোট বহু ছবি তৈরি করার মধ্য দিয়ে যখন চ্যাপলিনের শিল্পবোধ ক্রমেই বাস্তবমুখীন হয়েছিল এবং অনুভূতি যতই মানবিকবোধে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল ততই যেন তিনি সাধারণ্যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিলেন এবং এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ফলেই একদিন চ্যাপলিন তাঁর সময়কার বেখাপ্পা সাজটি সম্পর্কে বলতে পেরেছিলেন—'That costume helps me to express my conception of the average man, of almost any man, of mayself.'

কিস্টোন প্রতিষ্ঠানের পুরো একটি বছরে চার্লি চ্যাপলিন ছবি করলেন মোট পঁয়ত্রিশখানা—এক রিল থেকে দুই রিল দৈর্ঘ্যের মধ্যে, মাত্র একটি ছাড়া। অবশ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তারা পরে অর্থাৎ ম্যাক সেনেট কিস্টোন ছেড়ে যাওয়ার পরে নেহাত এক ব্যবসায়িক চাল চেলে নতুন নামে, নতুন বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরোনো ছবি বেশ কিছু মাঝে মাঝে বাজারে ছেড়েছেন; দর্শকও চ্যাপলিনের নতুন ছবি মনে করে ভিড় করেছেন টিকিট ঘরে। এতে অনেকের ধারণা, কিস্টোনে চ্যাপলিনের ছবির সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু আসলে তা নয়। পয়ঁত্রিশখানা ছবির প্রথম কয়েকখানা অপরের পরিচালনায় চ্যাপলিনকে অভিনয় করতে হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠতেই এবং চিন্তাধারায় অনেকখানি মৌলিকতার পরিচয় দেওয়ার দরুন পরিচালনার যথাযথ সুযোগ চ্যাপলিন পেলেন। অবশ্য মাঝে দু-তিনটি ছবি করেছিলেন আর কারো সঙ্গে, যুগ্ম পরিচালনায়। এই সমস্ত ছবিতে মোটামুটি একটি মিল যা পাওয়া গিয়েছিল তা হচ্ছে সেই অদ্ভুত সাজটির, যদিও এরই মধ্যে এক-আধবার জিনিসটির এক-আধটু অথবা

বেশ খানিকটা রদবদল ঘটেছিল। সাজটি ছিল ঠিকই, কিন্তু তখনও চ্যাপলিনের শিল্পমানসে 'Conception of the average man' গড়ে ওঠেনি। তখন তাঁর সৃষ্টি চরিত্রটি কখনো হতো চোর, কখনো মাতাল, কখনো বা বাউণ্ডুলে, বোকা, হ্যাংলা, প্রেম-পাগলা অথবা ওই জাতীয় কেউ। বিন্যাস-বহুল ঘটনা বলে তেমন কিছু ছিল না সেই সমস্ত ছবিতে। যেমন-তেমন কিছু ঘটিয়ে দেওয়াই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য! এবং সেই ঘটিয়ে দেওয়া যেমন-তেমন-কিছুর মধ্যেই দেখা গেল চ্যাপলিন কখনো দরকার পড়লে গুলি ছুড়ে রিভলভারের মাথা থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছেন, পার্কের বেঞ্চে কোনো এক কামাতুর যুগলকে চুমু খেতে দেখে আবেগের আতিশয্যে সামনের গাছটাকেই জড়িয়ে ধরেছেন দেহের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে, প্রমত্ত অবস্থায় কোনো মহিলার পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে প্রচণ্ড এক ডিগবাজি খেয়ে পড়লেন নিচের এক সোফার ওপর এবং যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে ফুঁকতে লাগলেন হাতের সিগারেটটা। অথবা, নেমন্তন্ন বাড়িতে কোনো এক মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে করতে হঠাৎ পাশের ভদ্রলোকটির প্রতি নজর পড়তেই রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন,—কারণ যাঁর হাতটাকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে খেলা করতে করতে এতক্ষণ চ্যাপলিন এই অপরিচিতার সঙ্গে মধুর বাক্যালাপ করছিলেন, তিনি মেয়েটিরই সাক্ষাৎ স্বামী। অথবা কখনো কোনো বাগানে কোনো এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে করতে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল পায়ের বুড়ো আঙুলটার ওপর ছেঁড়া জুতোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নিজের অজান্তেই। তাড়াতাড়ি মাথার টুপিটাকে বেরিয়ে পড়া আঙুলটায় ঝুলিয়ে রেখে তবে তাঁর নিস্কৃতি। এমনই হাজারো ছোটখাটো খুঁটিনাটি দিয়ে চ্যাপলিন সেই সময়কার ছবির মামুলি ঘটনাগুলোকে অভাবনীয়ভাবে রসোত্তীর্ণ করে তুললেন। দর্শকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।

কিস্টোনে পঁয়ত্রিশখানা ছবির মধ্যে যে ছবিখানা দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড়ো এবং নানাদিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ম্যাক সেনেট পরিচালিত একটি ছয় রিলের ছবি—TILLIE'S PUNCTURED

ROMANCE ডি. ডব্লিউ, গ্রিফিত-এর যুগান্তকারী ছবি THE BIRTH OF A NATION-এর কিছু আগে মুক্তি পেয়েছিল বলে চ্যাপলিনের এই ছবিটি সর্বপ্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত বড়ো ছবি হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। ছবিতে চ্যাপলিন ও মাবেল নরমান্ড ছাড়া আর একটি প্রধান চরিত্রে যে-শিল্পী অভিনয় করেন তাঁর নাম মারি ড্রেসলার। ড্রেসলার এর আগে অভিনয় করতেন থিয়েটারে এবং প্রথম ছবিতে নেমেই তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। একটি পরিপুষ্টি কাহিনীর বাঁধুনি পেয়ে এবং অভিনয় ও অন্যান্য আঙ্গিকের কৌশলের সমৃদ্ধ হয়ে ছবিটি সেই যুগে রীতিমতো এক যুগান্তর এনে দিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চ্যাপলিনের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল আরো শতগুণ।

প্রায় এক বছর গত হতে চলল। চ্যাপলিনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে আগেভাগেই ম্যাক সেনেট তাঁকে বেঁধে রাখার জন্য তাঁর দাম চড়িয়ে দিলেন অনেকখানি—সপ্তাহে চারশ ডলার। কিন্তু চ্যাপলিন তখন আর সেই এক বছর আগেকার ভয় পাওয়া, আনাড়ি বিদেশি নন, তিনি এখন এক জাঁদরেল শিল্পী। বন্ধুদের পরামর্শে তিনি হেঁকে বসলেন সপ্তাহে সাড়ে সাতশ ডলার। সেনেট তাতে রাজি হলেন না। কিন্তু রাজি না হলে কী হবে, চ্যাপলিনের বাজারদর তখন বেড়ে গেছে অস্বাভাবিকভাবে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসেই তিনি 'এসানি,' নামে এক নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন কিস্টোনের মাইনে থেকে দশ গুণ বেশি মাইনেতে—সপ্তাহে বারোশ পঞ্চাশ ডলার হিসাবে।

এই নতুন প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে চ্যাপলিনের চিন্তাধারার ও কর্মপদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন এল। প্যান্টোমাইমের কায়দাকানুন ও কিস্টোনের অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি আশ্চর্য মৌলিকতার গুণে চ্যাপলিনের শিল্পসৃষ্টি অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি আশ্চর্য মৌলিকতার গুণ চ্যাপলিনের শিল্পসৃষ্টি ক্রমেই অধিকতর শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠতে লাগল। দৃষ্টিভঙ্গি যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এবং সেই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিকাশের শুরু হলো 'এসানি' প্রতিষ্ঠানের চোদ্দটি ছোট ছোট ছবির মধ্য দিয়েই। চ্যাপলিনের 'Conception of the

average man-এর জন্ম এখানেই—'এসানি'তে।

কিস্টোনে ছবি তৈরি করতে চ্যাপলিন সময় নিতেন মাত্র দু'তিন দিন। ঘটনা উদ্ভাবন করতে অথবা চিত্রনাট্য সাজাতে আগে থেকে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতেন না। একটা মোটামুটি কাঠামো ভেবে ক্যামেরা ও লোকজন নিয়ে কোনোরকমে শুটিং চালু করে দিলেই হলো, বাকিটুকু অর্থাৎ সবটুকুই যেমন মাথায় আসত তেমনি করা হতো। শুধু যে চ্যাপলিনই এই নিয়মে চলতেন তা নয়, কিস্টোনের অন্যান্য পরিচালকও এমনকি ম্যাক্ সেনেটও এই রকমই করতেন। নতুন প্রতিষ্ঠানে এসে কিন্তু পুরোনো অভ্যেসটাকে চ্যাপলিন অনেকখানি বর্জন করলেন। শুটিংয়ে নেমে পড়ার আগে গল্পটাকে নিয়ে ভাববার মতো যথেষ্ট সময় নিলেন, চিত্রনাট্যের একটা মোটামুটি খসড়া* তৈরি করলেন, এবং নানাদিক ভেবেচিন্তে শুটিংয়ের কাজে এগোলেন। যথেষ্ট ধৈর্য্য আর সংযমের পরিচয় পাওয়া গেল চ্যাপলিনের নতুন প্রচেষ্টার মধ্যে।

'এসানি'র চোদ্দটি ছোট ছোট ছবি চ্যাপলিনের আগেকার ছবিগুলোর মতোই হাসির গল্প, পেটে খিল ধরিয়ে দেওয়ার মতো হাসি। কিন্তু আগেকার চেয়ে ঢের বেশি মার্জিত, ঢের বেশি সূক্ষ্ম হয়ে উঠল 'এসানি'র গল্পাংশ ও তার চিত্ররূপ। ঢের বেশি বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করা হলো প্যান্টোমাইমের কায়দাগুলো। সর্বোপরি বিদ্রূপ, বেদনাবোধ আর চমৎকারিত্বের আভাস কাহিনী বা ঘটনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যেন ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠল। বিত্তহীন ব্যর্থপ্রাণ মানুষের কথা অনেকখানি অস্পষ্ট হয়েও যেন প্রথম অনুভব করা গেল এই বিদ্রূপ আর বেদনাবোধের মধ্য দিয়ে!

'এসানি'র চোদ্দটির ছবির মধ্যে যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তার নাম THE TRAMP—দুই রিলের একখানা ছবি। অন্যান্য ছবিগুলোর মধ্যে যেগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে HIS NEW JOB,

---

* এখানে জেনে রাখা দরকার যে ছবিতে শব্দ-যোজনার আগে পর্যন্ত চ্যাপলিন কখনো লিখিত চিত্রনাট্য ব্যবহার করেননি।

THE CHAMPION, WORK, THE BANK, POLICE তাদেরই তালিকাভুক্ত।

THE TRAMP–এ দেখা গেল ভবঘুরে চার্লি এক গুণ্ডাদলের খপ্পর থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করল। মেয়ের বাবা অর্থবান গৃহস্থ, তিনি পুরস্কারস্বরূপ চার্লিকে তাঁর গদিতে একটা চাকরি দিলেন। গুণ্ডার দল আবার এল বাপের সম্পত্তি চুরি করতে। চার্লি বাধা দিল। ফলে রিভলবারের গুলিতে চার্লির পা জখম হলো। মেয়েটির অকুণ্ঠ সেবায় চার্লির মনপ্রাণ ভরে উঠল আনন্দে, সমস্ত দেহে মনে কিসের যেন জোয়ার উছলে উঠল। কিন্তু সমস্ত সুখস্বপ্ন চুরমার করে দিয়ে এল মেয়েটির প্রেমাস্পদ। আশাহত চার্লি মেয়েটির উদ্দেশে ছোট একটা চিঠি লিখল, তারপর নিজের ছোট পুঁটলিটাকে কাঁধে চাপিয়ে চলল টুকটুক করে সামনের লম্বা রাস্তাটাকেই একমাত্র সম্বল করে—চলল ভবঘুরে চার্লি। চলতে চলতে শুধু একবারের জন্যে একটুখানি থামল সে, পেছনে তাকাল না,—শুধু ঘাড়টাকে একটু দুলিয়ে নিল—একটা দার্শনিক নিস্পৃহতার ভান;—তারপর আবার চলল টুকটুক করে সামনের দিকে। সামনে শুধু রাস্তা, মাঠ আর ঢলে পড়া আকাশ।

যে-অনুভূতি, যে-বিচারবুদ্ধি, যে-প্রেরণার জন্ম ১৯১৫ সালের দুই রিলের THE TRAMP ছবিতে, পরবর্তীকালে তারই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটল চ্যাপলিনের মহত্তর শিল্প প্রচেষ্টায়। চ্যাপলিনের পরবর্তী শিল্পকীর্তির মধ্যে যে একটা অসহ্য বেদনাবোধ, একটা প্রচণ্ড বিদ্রূপ, একটা সীমাহীন সংবেদনশীলতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় তারই একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন পাওয়া গিয়েছিল সেই যুগের সেই ছবিটিতে। এমনকি পরবর্তী ছবিগুলোর সঙ্গে এটির প্রকাশভঙ্গিরও একটা মিল খানিকটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, যদিও স্বাভাবিক নিয়মেই শেষের ছবিগুলোর তুলনায় THE TRAMP-এর আঙ্গিক অনেকখানি অমার্জিত, অনেকখানি অপরিণত ছিল।

THE BANK ছবিতেও চ্যাপলিনের এই বেদনাবোধের শিল্পায়ন যথেষ্ট আবেগমণ্ডিত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল এবং তারই কিছু পরে

POLICE নামে দুই রিলের ছবিতে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে সমাজ ও জীবনকে বিদ্রুপ করা হলো সেটাও চ্যাপলিনের শিল্পকীর্তির প্রথম যুগের একটি মস্ত বড় ঘটনা। POLICE-এ দেখানো হলো, সমাজের যারা চাঁই, যারা ফলাও করে লম্বাচওড়া নীতির ফিরিস্তি দিয়ে থাকেন অভাজনদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির চৌকাঠ পেরিয়ে আসেন নিতান্তই স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে। অথচ উন্মুক্ত আকাশ আর লম্বা রাস্তাকেই যারা ঘরবাড়ি করেছে সেই সব সাধারণ মানুষ ওই সমস্ত লম্বা-চওড়া নীতির ধার না ধেরেও নিজের অজান্তেই অহরহ যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে—যা তাদের সমস্ত সত্তার সঙ্গে, প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে—তা ওই সমস্ত তথাকথিত নীতি-বাগীশদের নিক্তিতে ওজন করা যায় না। কাহিনীটি ছোট ও নিতান্তই ব্যক্তিগত হলেও উপরোক্ত বক্তব্যটি মোটামুটি পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এবং তার ওপর অভিনয়সৌকর্যে ও খুঁটিনাটি কায়দায় সমস্তটাই যথেষ্ট প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। দর্শক হেসেছিল, হাসতে হাসতে দম হয়তো বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দম-আটকানো হাসির আড়ালে একটা গভীর বক্তব্য খানিকটা প্রচ্ছন্ন হলেও দর্শকমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এক কথায় চ্যাপলিনের উত্তরণের এক বিরাট অর্থপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে 'এসানি'র এই একটি বছর। এবং এখানেই চ্যাপলিনের দীর্ঘ দিনের শিল্প-সঙ্গিনী এডনা পারভিয়ান্স-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়।

পাঁচ

এডনা তখন স্ট্যানোগ্রাফারের চাকরি করতেন, অভিনয়ের কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না। কিন্তু প্রথম দর্শনেই চ্যাপলিন এডনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে প্রকৃত শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর হন। চেহারা, চালচলন, হাবভাব তাঁর সবকিছুতে চ্যাপলিন শিল্পী হওয়ার পক্ষে অনুকূল মনে করলেন এবং পঁয়ত্রিশখানা ছবিতে তাঁকে প্রধান স্ত্রীর ভূমিকায় নামালেন। দেখতে দেখতে চ্যাপলিনের সঙ্গে সঙ্গে এডনার নামও ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এডনাও একাত্মতাবোধ করেছিলেন

চ্যাপলিনের সঙ্গে যে তাঁর অবিশ্বাস্য রকমের উঠতি দিনেও তিনি চ্যাপলিনের কাছে সপ্তাহে মাত্র একশ ডলার নিয়েই কাজ করেছেন। এবং বহুবার শুধু চ্যাপলিনের সঙ্গ ছাড়তে পারবেন না জেনেই তার পনেরো গুণ বেশি মাইনের চাকরিও অতি সহজে প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বভাবতই স্টুডিওর সংশ্লিষ্ট লোকজন এবং বাইরের অনেকে চ্যাপলিন-এডনা প্রসঙ্গ নিয়ে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন এবং স্টুডিওর বাইরেও তাঁদের একাত্ম সম্পর্কের পরিচয় পেয়ে টিপ্পনি-কাটা কাগজওয়ালার দল দিনের পর দিন নানা ধরনের টিপ্পনি কেটে কাগজের পাতাগুলোকে জমজমাট করে রাখলেন। অবশ্য কাগজওয়ালারা এবং আরো অনেকে যে-ধরনের সরস পরিণতির আন্দাজ করেছিলেন তা মোটেই হলো না;—এডনার সঙ্গে পরিচয়ের তিন বছর পরেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে চ্যাপলিন বিয়ে করলেন মিলড্রেড হ্যারিস নামে ষোলো বছরের একটি মেয়েকে, যদিও ঠিক সেই সময়েই এনডার সঙ্গে তাঁর শিল্পসম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল। অবশ্য চ্যাপলিনের এই অপ্রত্যাশিত বিয়ের ব্যাপারটা এবং পাশাপাশি এডনা-চ্যাপলিন ঘনিষ্ঠতা কাগজওয়ালাদের পাতাগুলোকে আরো কিছুদিনের জন্যে গরম রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 'এসানি'তে পুরো একটা বছর কাটিয়ে চ্যাপলিন যখন একাধিক প্রতিষ্ঠানের আশার মুখে ছাই দিয়ে মিউচুয়্যাল কোম্পানি নামে এক নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন আগেকার মাইনের চেয়ে আরো দশ গুণ বেশি মাইনেতে, অর্থাৎ সপ্তাহে দশ হাজার ডলার হিসাবে, তখন তিনি সঙ্গে এডনাকে নিয়ে যেতে ভুললেন না। তিন বছরের আগেকার সেই নাম না-জানা বিদেশি তিন বছর পরে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে যে জাঁদরেল ব্যবসাদারদের এমন করে টনক নড়িয়ে দিতে পারলেন—এটাও চারদিকে এক মস্ত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। চ্যাপলিনের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যের জন্য তো বটেই, খানিকটা এই অস্বাভাবিক রকমের চড়া দরের জন্যেও।

*　　*　　*

'এসানি'র ছবিগুলোর মধ্যে যে-দৃষ্টিভঙ্গির অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল তা অনেক বেশি স্পষ্ট, অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়ে উঠল মিউচ্যুয়ালের ছবিগুলোর মধ্যে। খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুতেই আতিশয্যটা, যা তখনকার অধিকাংশ হাসির ছবির ক্ষেত্রে রীতিমতো একটা নীতিতে দাঁড়িয়েছিল—চ্যাপলিন এখন তা সম্পূর্ণ বর্জন করলেন। ঘটনাসংস্থাপনে, চরিত্রসৃষ্টিতে যথাযথ সংযমের ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। দর্শকের চোখে তখনকার সমস্ত কিছু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে উঠলেন চ্যাপলিন—অননুকরণীয় চ্যাপলিন—অনন্যসাধারণ চ্যাপলিন।

এক কথায় মিউচ্যুয়াল কোম্পানির ছবিগুলোর মধ্যে সামগ্রিকভাবে এক সুস্থ মানবিক-বোধের সহজ ও সুন্দর শিল্পায়ন প্রথম পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল। চ্যাপলিন বলেছেন, যেকোনো ক্ষেত্রে সাফল্যের মূলমন্ত্র হচ্ছে মানব চরিত্রের গভীর উপলব্ধি। ছেলেবেলা থেকেই বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রার ভেতর দিয়ে চ্যাপলিন মানবচরিত্রের বিচিত্র গতিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করেছেন এবং চেতনার বিভিন্ন স্তরে জীবন-সত্য তাঁর সামনে যেমনভাবে উদঘাটিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তিনি সেই অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যই তাঁর শিল্পপ্রচেষ্টায় প্রয়োগ করেছেন। চ্যাপলিনের সিনেমা-জীবনের গোড়া থেকেই কাহিনী বা ঘটনায় না হয়েও ছোটখাটো অ্যাকশন এবং নতুন নতুন ম্যানারিজম্-এর মারফত তা খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গতানুগতিকতার ধারাকে নাকচ করে দিয়ে আশ্চর্য মৌলিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেই সব অ্যাকশন এবং ম্যানারিজম। ফলে, প্রথম যুগের কাহিনীগুলো দর্শকের মনে রেখাপাত করতে পারল না সত্যি, কিন্তু চিরকালীন হয়ে রইল সেই ম্যানারিজমগুলো, দর্শকের মনে তা গেঁথে রইল। দেখতে না দেখতেই চ্যাপলিন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন দর্শক-সমাজে,—কাহিনীর জন্য নয়, তাঁর Chaplinesque অ্যাকশন এবং ম্যানারিজম্-এর জন্য।

ধীরে ধীরে চিন্তার উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটিয়ে ক্রমেই স্পষ্ট থেকে

স্পষ্টতর হয়ে উঠল একটা দৃষ্টিভঙ্গি,—মানবচরিত্রের যথাযথ উপলব্ধি—সহজ, সুন্দর ও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টিতে এবং খুঁটিনাটি সবকিছুতেই। চ্যাপলিনের শিল্পসৃষ্টির এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মিউচ্যুয়ালের দেড় বছর একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও অর্থপূর্ণ অধ্যায়।

পথচারীর মাথা থেকে টুপি উড়ে যাওয়াটা নিশ্চয় হাসির উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মজার ব্যাপারটা হয় তখন, যখন দেখতে পাই সেই উড়ন্ত টুপিটিকে ফিরে পেতে গিয়ে হাওয়া উজিয়ে ছুটতে হচ্ছে লোকটিকে। রাস্তা দিয়ে সোজাসুজি হেঁটে চলা কখনই একটা মজাদার ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা সরস হয়ে ওঠে তখনই, যখন দেখি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আচমকা একটা অত্যন্ত বেয়াড়া পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হলো লোকটিকে। অর্থাৎ অবাঞ্ছিত কোনো পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার নিষ্ফল চেষ্টার মধ্যেই রয়েছে কৌতুকরস সৃষ্টির মূল উপাদান,—এবং চার্লি চ্যাপলিনের শিল্পসৃষ্টির মূলেও এইটেই প্রথম ও প্রধান সূত্র। মানবচরিত্রের এই প্রধান সূত্রটি ধরেই চ্যাপলিন দেখালেন, সমাজের স্পর্ধিত জীব পুলিশটির পা ফসকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে অথবা অপরাধীর পিছনে ছুটতে ছুটতে ঘেমেনেয়ে নাজেহাল হয়েও তার পুলিশি ঠাট বজায় রাখার করুণ প্রয়াস। তিনি দেখালেন মাতলামির টাল সামলাতে না পেরেও মাতাল ভদ্রলোকটির 'ভদ্রলোক' সাজার প্রাণান্তকর কসরত, দেখালেন উদ্ধত সমাজের কেতাদুরস্ত পরিবেশের এক সম্ভ্রান্ত মহিলার পিঠ দিয়ে একদলা ঠাণ্ডা বরফ গলিয়ে দেওয়ার দুঃসাহসিক অপকীর্তি! এমনই আরো নানা রকম ঘটনা, অ্যাকশন ও ম্যানারিজম চ্যাপলিন তার মিউচ্যুয়ালের ছবি থেকে শুরু করে সামনের বিভিন্ন ছবিতে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে লাগলেন এবং প্রতিটিই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, অর্থ, রূপ, রস নিয়ে দর্শকসমাজে সমাদৃত হলো।

এখানে পুলিশটি না হয়ে যদি রামা-শ্যামার ওই হাল হতো অথবা সম্ভ্রান্ত মহিলাটির বদলে যদি হোটেলের পরিচারিকার পিঠ দিয়ে বরফের দলাটি গলিয়ে দেওয়া হতো তা হলেও কি দর্শকের কাছ থেকে তেমনি

সাড়া পাওয়া যেত? নিশ্চয়ই নয় এবং চ্যাপলিনের বাস্তব-দৃষ্টির ও সত্যোপলব্ধির একটি প্রমাণ এইখানেই। এ প্রসঙ্গেই চ্যাপলিন এক জায়গায় বলেছেন যে পৃথিবীতে দশজনের মধ্যে নয়জনই হচ্ছে গরিব। তাই একজন বিত্তশালী বেকায়দায় পড়লে আর নয়জনের আনন্দের সীমা থাকে না। স্বভাবতই, কেতাদুরস্ত সমাজের সম্ভ্রান্ত মহিলাটিকে বেয়াড়া অবস্থায় ফেলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে-সাড়া পাওয়া গিয়েছে, তার বদলে সেই অবস্থায় গরিব পরিচারিকাকে ফেললে দর্শকের কাছ থেকে পাওয়া যেত ঠিক তারই উল্টো প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ হাসির বদলে সেখানে আসত সমবেদনা, গরিবের প্রতি গরিবের মমত্ববোধ। ঠিক তেমনি আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক—রাষ্ট্রের স্পর্ধিত জীব পুলিসকে খুব অসহায় অবস্থায় দেখলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের—এবং নিঃসন্দেহে দর্শকদের—আনন্দে ফেটে পড়াটাই কি সহজ ও স্বাভাবিক নয়? শুধু তাই নয়,—চেহারায়, পোশাকে, পরিচ্ছদে চ্যাপলিন পুলিশকে করে তুললেন বিদঘুটে। তারই হিসাবমতো পৃথিবীর শতকরা নব্বই জনের একজন হয়ে পৃথিবীকে দেখেছিলেন বলেই এই সহজ, স্বাভাবিক ও বাস্তব কথাটি চ্যাপলিন এত সুন্দর করে দর্শকদের বোঝাতে পেরেছিলেন এবং দর্শকও তা বুঝতে এবং মেনে নিতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হননি। সর্বোপরি, চ্যাপলিন তাঁর প্রাক-সিনেমা যুগের ও পরবর্তী কিস্টোন ও 'এসানি'র অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন নির্বাক অভিনয়পদ্ধতিতে। ফলে, প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতা এবং মুভমেন্টের ছন্দোময়তায় অভিনয় হয়ে উঠল বাঙ্ময়। নিছক ক্লাউনে পর্যবসিত না হয়ে চ্যাপলিন হয়ে উঠলেন অনন্যসাধারণ, হয়ে উঠলেন সত্যিকারের কমেডিয়ান। ধীরে ধীরে এত দিনের বিদঘুটে সাজটিও একটা সম্পূর্ণ দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো।

অনাবিল হাসির আবরণে চ্যাপলিন কটাক্ষ করলেন গর্বস্ফীত সমাজের গোটা ব্যবস্থাকে, যেখানে দশজনের মধ্যে নয়জনই হচ্ছে গরিব, নয়জনই যেখানে লাঞ্ছিত। তিনি ব্যঙ্গ করলেন সামাজিক বৈষম্যকে; ধর্মান্ধতাকে, ব্যঙ্গ করলেন ঠুনকো অভিজাত—বোধকে,

ঔদ্ধত্য, শঠতা আর মিত্যা ভড়ংকে। এখানেও কিন্তু চ্যাপলিন কৌতুকরস সৃষ্টির সূত্রটিকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হলেন। অর্থাৎ বেয়াড়া পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়েও মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার প্রাণান্তকর ও হাস্যকর প্রয়াসের ভেতর দিয়ে তিনি রূপায়িত করলেন তাঁর জীবনদর্শন। ফলে সমাজের অব্যবস্থা, অবিচার ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ সরাসরি তাঁর ছবিতে স্থান পেল না। তার পরিবর্তে তিনি দেখালেন, প্রতিকূল আবহাওয়ায় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়েও এক 'খুদে ভবঘুরে' জীবনের সমগ্র ব্যর্থতার জ্বালা কাটিয়ে উঠে সমাজের মেকি মূল্যবোধগুলোকে আশ্রয় করে নিজেকে সমাজের ওপরতলায় প্রতিষ্ঠিত করার অর্থাৎ নিজেকে 'জাতে' তোলার দুরন্ত কসরতে মশগুল হয়ে আছে! প্রতিমুহূর্তেই বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে লোকটিকে, তবু সেই বেয়াড়া পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার তার সে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! যেন কিছুই হয়নি তার, যেন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক, সহজ পরিবেশেই সে বিচরণ করছে! পরিণতি ঘটে ব্যর্থতায়, বিপর্যয়ে, লাঞ্ছনায়,—সৃষ্টি হয় হাস্যকর পরিস্থিতির। কী অদম্য উৎসাহ এই খুদে মানুষটির! সমস্ত বঞ্চনাকে ঝেড়েমুছে খানিকটা দার্শনিক বৈরাগ্যের চালে একবার ঘাড় নাচিয়ে, ঠোঁট উলটিয়ে আবার টুকটুক করে চলে নতুন উদ্যমে, নতুন কাহিনীতে, নতুন পরিবেশে।

এমনি করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে চ্যাপলিনের বক্তব্য সাধারণ্যে সমাদৃত হলো অত্যন্ত স্পষ্ট ও গভীরভাবে। শ্ল্যাপষ্টিকের আবরণে আধুনিক যুগের ইতর সমাজব্যবস্থাকে শেষ করা হলো তীব্রভাবে, পোশাকি সভ্যতার মুখোশ পড়ল খুলে আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কৃত্রিম মূল্যবোধগুলোর অসারতার প্রমাণ পেয়ে ও সর্বসমক্ষে সেগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন হতে দেখে পৃথিবীর শতকরা নব্বইজন মানুষ প্রাণ খুলে হেসে উঠল।

কিন্তু এখানেই দর্শক থামল না। এই হাসির আড়ালে যে একটা যুগের গভীর ট্র্যাজেডি লুকিয়ে রয়েছে তার সুরও দর্শকের মর্মে গিয়ে

পৌঁছাল। ব্যর্থতার গ্লানি যে লোকটিকে এতটুকু দমাতে পারে না,—মানুষের মতো পুরো সম্মান ও সম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকার উদগ্র কামনায় অচঞ্চল বিশ্বাসে বুক বেঁধে যে এগিয়ে চলেছে টুকটুক করে—সেই খুদে ভবঘুরের প্রতি, সেই অতি সাধারণ মানুষের প্রতি—আশাহত লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনায় দর্শকের মন উপছে উঠল। অফুরন্ত হাসির আড়ালে মূর্ত হয়ে উঠল এক চরম বেদনার ছবি। চ্যাপলিন একাধারে হয়ে উঠলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান এবং ট্র্যাজেডিয়ান।

১৯১৬-১৭ সালের দেড় বছরে চ্যাপলিন মিউচ্যুয়াল কোম্পানির হয়ে যে বারোখানা দুই রিলের ছবি তুললেন মোটামুটি সবগুলোর মারফতই চ্যাপলিনের বক্তব্য যথেষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল এবং অভিনয়ক্ষেত্রেও ব্যালেটাইজড্ মুভমেন্টের (balletised movement) প্রয়োগ ও তার নিপুণ সম্পাদনার ফলে আঙ্গিকের দিক থেকেও এক নতুনতর ও বলিষ্ঠতর আমেজ পাওয়া গেল। ছোট হলেও গল্পাংশগুলোর অনেক বেশি সুসংবদ্ধ, সংযত ও জীবনাশ্রয়ী হয়ে উঠল এবং সবকিছুতেই যথেষ্ট চিন্তা, গভীরতা ও হৃদয়াবেগের ছাপ অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। সব কটাই চ্যাপলিনের রচনা, পরিচালনাও সম্পূর্ণ তাঁরই; এবং প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের প্রতিটিতেই নামলেন তাঁর শিল্পী-সঙ্গিনী এডনা। অন্যান্য ছোটখাটো চরিত্রেও অভিনেতাদের বড় একটা অদলবদল হলো না এবং 'এসানি' থেকে শুরু করে যাঁকে চ্যাপলিন আজ পর্যন্ত একটা ছবির জন্যও ছাড়তে পারেননি তিনি হচ্ছেন ক্যামেরাম্যান রোলি টুথেরা। মিউচ্যুয়ালের বারোটি ছবির মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে THE VAGA- BOND, THE PAWNSHOP, EASY STREET, THE IMMIGRANT, THE ADVENTURER ও THE CURE, একটি ছবিতে– ONE A. M.—এক ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে সামান্য একটুখানি ছাড়া সমস্তটা চ্যাপলিন একাই অভিনয় করলেন। সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক ও দুঃসাহসিক হওয়া সত্ত্বেও প্যান্টোমাইমের সুনিপুণ কসরতে চ্যাপলিন পুরো দুটো

রিলে দর্শককে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। উপরোক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর সব কটাই যে এক জাতের তা নয়,—কোনোটাতে বিদ্রূপের মাত্রাটা অনেক বেশি তীব্র, কোনোটা বা অধিকতর বেদনামণ্ডিত আর কোনোটায় Chaplinesque অ্যাকশন ও ম্যানারিজম্ ঘটনাকে বেশ খানিকটা ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু চ্যাপলিনের শিল্পবোধ ও চেতনা প্রতিটিতেই আগেকার ছবিগুলোর চেয়ে ঢের বেশি সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে রূপায়িত হলো চ্যাপলিনেরই বিশিষ্ট ঢংয়ে বিশিষ্ট কায়দায়।

*　　*　　*

মিউচ্যুয়াল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি যখন শেষ হয়ে আসছিল তখন সেই প্রতিষ্ঠানই আরো বারোখানা ছবির জন্য নতুন করে চ্যাপলিনকে চুক্তিবদ্ধ করতে চাইলেন। বলা বাহুল্য, আগেকার মাইনের চেয়ে এবার দর চড়ে গেল অনেক বেশি এবং চ্যাপলিন কিছু বলার আগে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তা চড়িয়ে দিলেন। তাতে রাজি না হয়ে চ্যাপলিন ফার্স্ট ন্যাশনাল সারকিট নামে এক নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। দেড় বছরের মধ্যে তাঁকে আটখানা ছবি করতে হবে, কিন্তু ছবির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। নতুন স্টুডিওতে নিজের ইউনিট নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছবি করার সুযোগ পেলেন চ্যাপলিন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেলেন মাসে মাসে এক স্বপ্নাতীত টাকার অঙ্ক।

মিউচ্যুয়ালের শেষ ছবি THE ADVENTURER শেষ করে দু'চারজনকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাপলিন 'হাওয়াই'তে গেলেন হাওয়া বদল করতে এবং সেখানে সামান্য কিছুদিন থেকেই ফিরে এলেন কর্মস্থলে। নতুন স্টুডিও তৈরি হলো, বড় ভাই সিডনি এসে চ্যাপলিনের সঙ্গে যোগ দিলেন ও নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হলো। অধিকতর নিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি ও সময় নিয়ে আটখানার জায়গায় দেড় বছরে চ্যাপলিন তৈরি করলেন মাত্র তিনখানা তিন রিলের ছবি- A DOG'S LIFE, SHOULDER ARMS ও SUNNYSIDE. শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আরো একটা ধাপ

এগিয়ে গেলেন তিনি,—অ্যাকশন, ম্যানারিজম ও ঘটনা ছাড়াও যে-দিকটার প্রতি বিশেষ নজর দিলেন তা হলো ব্যক্তি-চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। দিনের পর দিন ফলবন্ত হয়ে উঠল চ্যাপলিনের শিল্পবোধ।

প্রথম মহাযুদ্ধ এই সময়ে রীতিমতো বিরাট আকার ধারণ করে। চারদিক থেকে চ্যাপলিনের স্টুডিওতে চিঠি আসতে লাগল, চ্যাপলিন এখনো কেন চুপ করে বসে আছেন, কেন তিনি যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাচ্ছেন না, ইংল্যান্ডবাসী হয়ে তাঁর এই নিষ্ক্রিয়তার অর্থ কী ইত্যাদি। অর্থাৎ যুদ্ধের ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে চ্যাপলিনকে নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গেল দেশ-বিদেশে। কেউ কেউ অবশ্য ধারণা করলেন, বেঁটে খাটো হওয়ার দরুনই হয়তো সামরিক জীবনের চাহিদা মেটাতে তিনি অক্ষম। যাই হোক, চ্যাপলিনের তরফ থেকে এর কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না, কাজের দিন থেকে দেখা গেল যে প্রথম ছবি A DOG'S LIFE শেষ করেই তিনি দুই মাসের জন্য যুদ্ধের চাঁদা তুলতে বেরিয়ে পড়লেন সদলবলে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিনেমাজগতের মহারথী ডগলাস ফেযারব্যাঙ্কস ও মারি পিকফোর্ড। রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন তাঁরা, কখনো প্যান্টোমাইম, কখনো বা ছোট ছোট স্কেচ জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করলেন। মুক্তহস্তে জনসাধারণের Liberty Loan-এর তহবিলে অর্থ সাহায্য করলেন।

আরো একটি জিনিস চ্যাপলিন করলেন। Liberty Loan-এর বিষয়টিকে আরো জোরদার করার জন্য TEE BOND নামে ছোট্ট একটি প্রচারমূলক ছবি তিনি তৈরি করলেন তাঁরই বিশিষ্ট ঢংয়ে। ছবিটির শুরুতে টাইটেল মারফত জানিয়ে দিলেন—There are different kinds of Bonds : The Bond of Friendship, the Bond of love, the marriage Bond and most important of all- the Liberty Bond', এডনাও এই ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন এবং ১৯১৮ সালে আমেরিকার সর্বত্র বিনা পয়সায় ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছিল।

১৯১৮ সালে এই কর্মবহুল সময়েই চ্যাপলিনের সঙ্গে মিলড্রেড হ্যারিসের প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন মিলড্রেডের বয়স মাত্র ষোলো বছর,

আর চ্যাপলিনের উনত্রিশ। দশ বয়স থেকে বিভিন্ন সিনেমা-প্রতিষ্ঠানের ছোটবড় ভূমিকায় অভিনয় বছর করতে করতে সেই সময় তিনি এসে পড়েছেন ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে। প্রথম দর্শনেই চ্যাপলিন মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেলেন, কাজ থেকে একটু ফাঁক পেলেই তিনি গাড়ি নিয়ে ছুটতেন ইউনিভার্সাল স্টুডিওর দিকে এবং এমনকি কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসেও থাকতেন স্টুডিওর দরজার বাইরে কখন মেয়েটির ছুটি হবে এই আশায়। গর্বে মিলড্রেডের বুকখানা ফুলে উঠত অনেকখানি, তার প্রেমাস্পদ যেমন-তেমন কেউ নয়—স্বয়ং চার্লি চ্যাপলিন! মিলড্রেডের এই বিষয়ে নিজস্ব কোনো মত ছিল বলে মনে হয় না এবং চ্যাপলিন নিজেও যে তাড়াতাড়ি বিয়ের জন্য একটা শোরগোল লাগিয়ে দিয়েছিলেন এমন কোনো প্রমাণও কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেককেই অবাক করে দিয়ে—হয়তো নিজেদেরও–চ্যাপলিন মিলড্রেডকে বিয়ে করলেন ১৯১৮ সালের ২৩ অক্টোবর।

যথারীতি এক সপ্তাহের মধুচন্দ্রিমার পরে নবদম্পতি নতুন বাড়ি করলেন হলিউডেরই একাংশে। মিলড্রেড ভাবলেন, নতুন ঘরে প্রাণের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন তাঁরা দুজনে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সবকিছুই যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেল, চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ গজিয়ে উঠল মিলড্রেডের মগজে। মিলড্রেড বললেন, তাঁর স্বামী তাঁকে একটুও ভালোবাসেন না, তাঁকে অপমান করেন ঝি-চাকরের সামনে : তাঁর কথা—তাঁর শরীরের কথা, মনের কথা, এতটুকু ভাবেন না, বাইরের একটি মেয়েই নাকি তাঁর দাম্পত্যজীবনের সমস্ত অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।—চ্যাপলিনের তরফ থেকে অবশ্য এর কোনো জবাব বিশেষ শোনা যায়নি। যেন খানিকটা নির্লিপ্ত ভাব নিয়েই তিনি ডুবে রইলেন নিজের কাজে। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে মিলড্রেডের একটি পঙ্গু সন্তান হলো, জন্মের তিন দিন পরেই অবশ্য সন্তানটি মারা গেল। তারই অল্প কিছুদিন পরে দেখা গেল চ্যাপলিন ও মিলড্রেড আলাদা বাড়িতে থাকছেন, যদিও মিলড্রেডের সমস্ত খরচ চালাচ্ছিলেন চ্যাপলিন নিজেই।

ধীরে ধীরে দাম্পত্যকলহ বিরাট আকার ধারণ করল, চ্যাপলিনের পক্ষে চোখ-কান বুজে শিল্পকর্মে ডুবে থাকা আর সম্ভব হলো না। এমন করে চলল কিছুদিন, তারপর একদিন মিলড্রেড বিবাহবিচ্ছেদের নালিশ জানালেন কোর্টে। চ্যাপলিনের উকিল পরামর্শ দিলেন যে তাঁর নির্মীয়মাণ ছবি THE KID-এর যাবতীয় মালমসলা অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা দরকার, কারণ এমনও হতে পারে যে কোর্ট থেকে দোষী সাব্যস্ত হলে অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে চ্যাপলিনের ওই ছবিটিরও একটা অংশ মিলড্রেড পাবেন। কথাটা শুনেই চ্যাপলিন রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন। অতীত জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার দামে কেনা তাঁর এই নির্মীয়মাণ ছবিটি,—একে তিনি অক্ষত অবস্থায় দেখতে চান। এ তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না। এক রাতে চ্যাপলিন সকলের অজ্ঞাতে তাঁর বিশ্বস্ত জাপানি ড্রাইভার 'কোনো'র সাহায্যে THE KID-এর সমস্ত মালমসলা নিয়ে পালিয়ে গেলেন ক্যালিফোর্নিয়ার আইনের নাগালের বাইরে। পরে অবশ্য গোলমাল কেটে গেলে চ্যাপলিন ছবিটি শেষ করতে পেরেছিলেন।

গোলমাল কেটেছিল ১৯২০ সালের ১৯ নভেম্বর। বিশেষ কোনো ঝামেলা না ঘটে কোর্টের আদেশে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটল বিয়ের দুই বছর পরেই।

ছয়

ফার্স্ট ন্যাশনাল সারকিটের প্রথম ছবি A DOG'S LIFE উঁচুদরের সমালোচকদের মতে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে। তিন রিলের এই ছবিটিতে বাস্তব পরিবেশে বেকারত্বের বিড়ম্বনা ফুটিয়ে তোলা হলো, রাস্তার কুকুরের জীবনের সঙ্গে অনাদৃত ভবঘুরের জীবনের যোগসূত্র তুলে ধরা হল অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে। কাহিনীর সামগ্রিকতায় সামাজিক বিদ্রূপ ও বেদনাবোধ আগেকার ছবিগুলোর চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকের দিকটাও এগিয়ে গেল আরও অনেকখানি। আসল বিষয়বস্তুর সঙ্গে শ্ল্যাপস্টিকের টুকিটুকি যথারীতি জুড়ে দেওয়াতে

গুরুগম্ভীর বক্তব্যটি পুরোপুরি Chaplinesque হয়ে উঠল।

ভোর হতেই দেখা গেল শহরের একাংশে এক পরিত্যক্ত মাঠে এক বেড়ার পাশে ঢিলে পায়জামা, আঁটসাঁট কোট আর বিদঘুটে বুট জুতো পরে চার্লি ঘুমিয়ে রয়েছে। কাছেই ঘুমিয়ে রয়েছে একটি কুকুর। দুজনেই এক জাতের—চার্লি আর কুকুর, দুজনের গতিবিধি, চালচলন এক। রাস্তাটাকেই এরা ঘরবাড়ি করেছে, এদের একমাত্র সম্বল হলো উন্মুক্ত আকাশ আর এলোমেলো রাস্তা। সত্যিকারের ভবঘুরে হয়ে দাঁড়িয়েছে এরা। পুলিশকে রীতিমতো সমঝে চলতে হয় দু'জনকেই, পালিয়ে তবে রক্ষে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় যখন একদল উমেদারের ভিড়ের মধ্যে চার্লি একটা যেমন-তেমন চাকরি পাওয়ার আশায় মরিয়া হয়ে লড়াই করছে, তখন দেখা যায় রাস্তার মধ্যখানে সামান্য একটুখানি খাবার নিয়ে অনেকগুলো কুকুরের সঙ্গে কামড়াকামড়িতে লিপ্ত রাস্তার সেই কুকুরও। বেকার চার্লি একটা গভীর একাত্মতা বোধ করে না খেতে পাওয়া কুকুরটির সঙ্গে। দুজনে গিয়ে বসে দূরের একটা বাড়ির রকে। সামান্য আদর আর সহানুভূতি পেয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে যায় কুকুরটি, কৃতজ্ঞ-চিত্তে চার্লির শরীরটাকে চাটতে থাকে! এরপর থেকে দেখা যায় দুজনে যেন জমেছে বেশ, নানা ফিকিরফন্দি করে খাবার জুটছে দুজনেরই—অবশ্য তার জন্য ঝামেলাটাও সইতে হচ্ছে বড় একটা কম নয়। কুকুরটাকে কোলেপিঠে করে অথবা প্যান্টের পকেটে পুরে চার্লি কখনো পাউরুটির দোকানে হানা দেয়, কখনো কোনো কেতাদুরস্ত হোটেলে, কখনো বা অন্য কোথাও। হোটেলের একটি সহজ সরল শান্ত মেয়েকে চার্লির মনে ধরে। মেয়েটিও এত দিন ভালোবাসার কাঙাল হয়ে মাথা খুঁড়ে মরছিল। কিন্তু পকেট ফাঁকা বলেই হোটেলের মালিক চার্লিকে মেয়েটির কাছে ঘেঁষতে দেয় না, বের করে দেয়। ইতিমধ্যে দু'জন গুণ্ডার চুরি-করা বেশ কিছু টাকা কড়ির একটা থলে চার্লির হস্তগত হয়। থলেটি আর কুকুরটিকে নিয়ে চার্লি মস্ত এক ভারিক্কি চালে আবার হোটেলে ঢোকে। ঢুকে দেখে মেয়েটি কাঁদছে। হোটেলের মালিক নাকি তাকে জবাব দিয়েছে, বাকি সামান্য মাইনে পর্যন্ত দেয়নি। হোটেলের

খদ্দেরদের অর্থাৎ ওই গুণ্ডা দু'জনের বদখেয়ালমাফিক চলেনি বলেই এইভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। চার্লি মেয়েটিকে আশ্বস্ত করে,—ভাবনা কি, সে আজ অনেক কিছুর মালিক;—ভবিষ্যৎ ঘর-সংসার, সন্তান-সন্ততি কোনো কিছুতেই আর কেউ বাদ সাধতে পারবে না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বাদ সাধল হোটেলের মালিক আর গুণ্ডা দুজন। এর পরেই চলে দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের খপ্পরে গিয়ে পড়ে দুজন গুণ্ডা আর আড়ালে সটকে পড়ে চার্লি, মেয়েটি আর কুকুরটির—মুখে তার সেই থলেটা।

স্বপ্ন সফল হতে চলল। শান্ত, স্নিগ্ধ গ্রামীণ পরিবেশে ছোট্ট একটা বাড়ি। বাগানে গাছের চারা লাগাচ্ছে চার্লি। বউটি অর্থাৎ মেয়েটি ডাকতেই চার্লি উঠে গেল তার কাছে। দুজন দুজনকে কাছে টেনে নেয়, আলিঙ্গন করে। অদূরে দেখা যায় কতকগুলো কাচ্চাবাচ্চা পরিবেষ্টিত হয়ে কুকুরটি সগর্বে লেজ নাড়ছে।

ফার্স্ট ন্যাশনালের দ্বিতীয় ছবি SHOULDER ARMS প্রথম প্রদর্শিত হলো উপরোক্ত ছবির ছয় মাস পরে,—১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে—হবার্সাই চুক্তির তিন সপ্তাহ আগে এই ছবিতে চ্যাপলিন কটাক্ষ করলেন সামরিক জীবনকে এবং যুদ্ধকে। যুদ্ধের সর্বগ্রাসী অপকীর্তির মাঝে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপায়িত হলো তাঁরই নিজস্ব ঢংয়ে। এতেও পরিপূর্ণ একটা গল্পের সীমানার মধ্যে পরিষ্কার ফুটে উঠল একটা ট্র্যাজেডি আর তারই সঙ্গে রইল বিদ্রূপের কশাঘাত, হাসির হুল্লোড় আর শ্ল্যাপস্টিকের মাধুর্য।

প্রথমে ঠিক ছিল এক পাঁচ রিলের ছবি করা হবে; তোলাও হলো ওই হিসাবটিকে মাথায় রেখেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাহিনীকে সুসংবদ্ধ করতে গিয়ে ছেঁটেকেটে এটিকে তিন রিলের ছবিতেই দাঁড় করানো হলো।

SHOULDER ARMS-এর শুরু এক সামরিক শিক্ষাশিবির থেকে। অনেকের মধ্যে দেখা গেল সামরিক বেশে আনাড়ি চার্লি কুচকাওয়াজ করছে, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না—

প্রতিপদে নানাভাবে নাজেহাল হতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কমান্ডারের দাবড়ানি খেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চার্লি বিছানা গ্রহণ করল।

পট পরিবর্তন হলো। ট্রেঞ্চ। জিনিসপত্তর ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে—বন্দুক, রাইফেল, কম্বল, ঘটি, বাটি, থালা ইত্যাদি; আর তারই মাঝে দেখা গেল সামরিক বেশে চার্লি, পাশে সহকর্মী এক সার্জেন্ট। পাশাপাশি দেখানো হলো আর একটি ট্রেঞ্চ, জার্মান সৈন্যতে গিজ গিজ করছে জায়গাটা। জাঁদরেল এক জার্মান অফিসার ভারিক্কি চালে এল সেখানে কাজকর্ম কেমন চলছে তা তদারক করতে। কেউ কাজে এতটুকু শিথিলতা দেখিয়েছে কি আর রক্ষে নেই,—লাথি, কিল, চড় মেরে তাদের শায়েস্তা করা হচ্ছে। মিত্রপক্ষের ট্রেঞ্চে কিন্তু চার্লি আর সেই সার্জেন্ট দিব্যি আরামে হাত-পা ছড়িয়ে ভালোমন্দ কী সব খাবার গিলেই চলেছে, বাইরে যদিও ঠিক ওই সময়েই শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টিবাদলার মধ্যেও চার্লির এতটুকু অবসর নেই, বন্দুক টহল দিয়ে মিত্রপক্ষের ঘাঁটি তাকে সামলাতে হচ্ছে। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে সৈনিক চার্লি, কিন্তু বিরাম নেই এতটুকু। অবশ্য তারই মধ্যে টুক করে ছোট এক টুকরো স্বপ্ন দেখে নিল সে।—নিউইয়র্কের রাস্তা—যুদ্ধজনিত উন্মত্ততার এতটুকু ছোঁয়া নেই কোথাও। হোটেলের বেয়ারা মদ হাতে এল চার্লির সামনে। চার্লি ফিক করে একটুখানি হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ট্রেঞ্চে,—দারুণ বৃষ্টি, চারদিকে জলকাদা দাঁড়িয়ে গেছে। পাহারা বদল হতেই টুক টুক করে ছুটে এলো কর্মক্লান্ত চার্লি, ধপাস করে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

পিয়ন চিঠি নিয়ে এল অনেকের জন্যই, কিন্তু চার্লির জন্য কোনো চিঠি নেই। ভেঙে পড়ার লোক নয় চার্লি। সহকর্মী এক সৈনিকের বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, চিঠি পেয়ে ও পড়ে আর দশজনের মতোই তার চোখেমুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি ফুটে উঠেছে। অদূরে বসে চার্লি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন একাত্মা হয়ে গেল তার সঙ্গে—সহকর্মীর আনন্দ-তৃপ্তি যেন তারই আনন্দ, তারই তৃপ্তি।

পিয়ন আবার ফিরে এসে চার্লির হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে গেল।

প্যাকেটটা খুলে দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে কয়েকটা কুকুরের বিস্কুট আর কিছু পনির। মুখে গ্যাসমাক্স এঁটে চার্লি জোরে ছুড়ে মারল পনিরের দলাটি। দলাটি গিয়ে পড়ল দূরে এক জার্মান অফিসারের মুখের ওপর,—একেবারে লেপটে গেল তার গোটা মুখটায়। অফিসারটি ঠিক সেই সময় প্যারিস বিজয়ের উৎসবে মত্ত ছিল।

জলবৃষ্টির মধ্যে অন্যান্য সহকর্মীর সঙ্গে চার্লিকে শুতে হলো ট্রেঞ্চে। পা আর মুখটাকে, কখনো বা শুধু নাকটাকে, নানা প্রক্রিয়ায় কোনো রকমে ভাসিয়ে রেখে বর্ষায় ভাসানো ট্রেঞ্চে কাটিয়ে দিতে হলো ঘুমের সময়টা। নাকটাও যদি বা কখনো ডুবে গেল তখন লম্বা একটা নল নাকের সঙ্গে লাগিয়ে রেখে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের একটা ব্যবস্থা করা হল।

দেখা গেল একদল জার্মান বন্দীর মাঝে সদর্পে ঘোরাফেরা করছে সৈনিক চার্লি।—একবার সে এক বেঁটে খাটো অফিসারকে কোলে তুলে নিয়ে মাথায় দুটো চাপড় মেরেই নামিয়ে দিল তাকে। কে একজন প্রশ্ন করল কেমন করে এতগুলো লোককে সে গ্রেপ্তার করতে পারল। গুরুগম্ভীর চালে চার্লি জানিয়ে দিল, একাই সে তাদের সবাইকে ঘিরে ফেলেছিল।

'হতশ্রী ফ্রান্স! ধ্বসে পড়া এক বাড়ির দোরগোড়ায় বসে রয়েছে এক ফরাসি মেয়ে—যেন সমস্ত কিছু হারিয়ে বসেছে সে। চারদিকে জড়িয়ে একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশ। আর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি তার শীর্ণ দুটো হাতের মধ্যে বেদনামণ্ডিত মুখখানাকে লুকিয়ে রাখল।

এরপর আবার চলল চার্লির টুকিটাকি অ্যাকশন। ট্রেঞ্চে বসে মদ খাওয়ার দরকার পড়তেই বোতলটাকে তুলে ধরল ওপরের দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের গুলিতে বোতলের মাথাটা গেল উড়ে। ঢকঢক করে পুরো বোতলটা খেয়ে ফেলল চার্লি আর তার সহকর্মী সার্জেন্ট। সিগারেট ধরানোর দরকার পড়েছে, চার্লি অমনি সিগারেটের মাথাটা তুলে ধরল ওপরের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের গুলি মাথাটাকে ধরিয়ে দিয়ে গেল। এইরকম ছোট ছোট অনেক ঘটনা ঘটার পরে

চার্লিকে বলা হলো এগিয়ে যেতে, চার্লিও এতটুকু ভড়কে না গিয়ে বীরের মতো এগিয়ে চলল সামনের দিকে—একেবারে শত্রুপক্ষের শিবিরের মধ্যে। গাছগাছড়া ডালপালা দিয়ে চার্লির সমস্ত দেহটাকে ঢেকে দেওয়া হলো, পুরোদস্তুর একটা গাছ বনে গেল চার্লি, চলল তাঁর একক অভিযান। পাতা আর ডালের ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে চার্লি দেখল কয়েকজন জার্মান সৈনিক রান্নার কাঠ কাটতে কুড়াল হাতে এগিয়ে আসছে ওই দিকেই। সুবিধে ছিল এই যে চার্লি ওখানে একাই গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, সত্যিকারের গাছও বেশ কিছু চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নানা কায়দায় কয়েকটি সৈনিককে ওখানেই চার্লি ঘায়েল করল। সৈনিকের দল কেউই ঠাহর করে উঠতে পারছে না কে তাদের শত্রু—চারদিকেই তো শুধু গাছ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই জার্মান সৈন্যরা চার্লির চালাকি ধরে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গে চলল দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি। পুরোদস্তুর একটা গাছ ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে, এঁকেবেঁকে চলেছে গাছটা বনবাদাড় পেরিয়ে। সৈন্যদের এবং দর্শকদের বারবার ভুল হচ্ছে, বুঝতে পারছে না যে কোনটা গাছ আর কোনটা চার্লি। শেষ পর্যন্ত সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চার্লি গিয়ে উঠল ফ্রান্সের সেই বিধ্বস্ত বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকেই চার্লি দরজটা শক্ত করে এঁটে দিল, যদিও চারদিকে দেয়ালের চিহ্নমাত্র নেই। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল চার্লি, ধপ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়, পাশের জানালাটাকে টেনে দিতে ভুলল না। মাথার ওপর ছাদের একটা টুকরোও অবশ্য অবশিষ্ট নেই, শুধু উন্মুক্ত আকাশ। ভেঙেপড়া বাড়ির একমাত্র বাসিন্দা মেয়েটি ছুটে এল তার কাছে, মনে করল বুঝি এক আহত সৈনিক। ভাষা দুজনের কাছেই অবোধ্য, অথচ কথা বলার আগ্রহটা দুজনেরই অদম্য। নানাভাবে ইশারায় চার্লি বুঝিয়ে দিল যে সে এক সাধারণ আমেরিকান। আনন্দে অধীর হয়ে উঠল মেয়েটি। দুজন, দুজনকে কাছে টেনে নিল।

কিন্তু বিশ্রামের এতটুকুও অবসর নেই চার্লির। জার্মানিরা এসে পড়তেই আবার চলল দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি, ধরপাকড়। তারপর নানা ফিকির-ফন্দির পর চার্লি এক অদ্ভুত কৌশলে কাইজারকে বন্দী করে

হাজির করল একেবারে মিত্রপক্ষের আড্ডাখানার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হইচই পড়ে গেল সারা তল্লাটটায়। পৃথিবীতে শান্তি নিয়ে এল চার্লি।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে চার্লির ঘুম ভেঙে গেল। চোখ রগড়ে আড়মোড়া ভেঙে চার্লি দেখে তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে দুজন সহকর্মী। প্রথমটা ঠিক ঠাহর করতে পারে না চার্লি। তারপর অবস্থাটা সমঝে নিয়ে শুধু মাথাটা একবার চুলকে নেয়।

এক বছরেই দুটো ছবি– A DOG'S LIFE ও SHOULDER ARMS চ্যাপলিনকে যে স্থায়ী সম্মানে ভূষিত করল পরবর্তী ছবি SUNNYSIDE এবং তার কিছু পরে যে A DAY'S PLEASURE -এর ক্ষেত্রে তেমন হলো না। ছবি দুটো দর্শকসমাজে তেমন সমাদৃত হলো না। অবশ্য এই দুটি ছবির মধ্যে SUNNYSIDE কয়েকটি বিশেষ কারণে চ্যাপলিনের প্রতিভার কিছু ছাপ রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিল। তার একটি হচ্ছে ছবিতে ব্যালের আঙ্গিকের উন্নততর প্রয়োগ। অনেকের মতো ছায়াছবির ইতিহাসে ব্যালের সামগ্রিকতা প্রথম পরিবেশিত হয় চ্যাপলিনের SUNNYSIDE ছবিতেই। সে যাই হোক, এই ছবিটি এবং পরবর্তী ছবি A DAY'S PLEASURE অপেক্ষাকৃত কম স্বীকৃত হওয়ার দরুন দর্শকমহলে রীতিমতো এক ভয়ের সঞ্চার হলো। কারণ ইতিমধ্যে কমেডিয়ান হিসেবে আমেরিকার ছবির বাজারে আরো কয়েকজন বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন, এবং তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হ্যারল্ড লয়েজ, লারি সমেন, বাস্টার কিটন। একটা প্রতিযোগিতার আবহাওয়া দর্শক মনে তৈরি হতে লাগল। এই প্রতিযোগিতার বাজারে সবাইকেই অনেক বেশি অবহিত হতে হবে, অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। চ্যাপলিনের ওপর যাঁদের অগাধ বিশ্বাস, যাঁরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, স্বভাবতই তাঁরা চ্যাপলিনের শেষ প্রচেষ্টা দুটোর ফলাফল দেখে, বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে চ্যাপলিনের দাম্পত্য জীবনের গোলমাল এই সময়েই বিশ্রীভাবে পাকিয়ে উঠেছিল।

*　　*　　*

সপ্তাহে যে-ব্যক্তি একখানা করে ছবি করতে শুরু করেছিলেন, কয়েকটা বছর যেতে না যেতেই দেখা গেল তার কর্মপদ্ধতিতে একটা মস্ত পরিবর্তন এসে গেছে। অন্যান্য যেকোনো পরিচালকের চেয়ে ঢের বেশি ফিল্ম খরচ করাটা চ্যাপলিন রীতিমতো একটা বাঁধাধরা নিয়মে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দুই হাজার ফিট অথবা তার চেয়ে সামান্য কিছু কম দৈর্ঘ্যের ছবি করতে তিনি খরচ করতে লাগলেন ত্রিশ থেকে নব্বই হাজার ফিট ফিল্ম, এবং সময় নিতেন প্রায় ছয় মাস,—কখনো বা বেশি। পরবর্তী জীবনে আট রিলের ছবি করতে চ্যাপলিন একাধিকবার প্রায় পাঁচ লাখ ফিল্ম খরচ করেছেন, এবং সময় নিয়েছেন এক বছর থেকে দুই বছর পর্যন্ত। অসম্ভব রকমের খুঁতখুঁতে মন ছিল বলেই একই দৃশ্য তুলেছেন বহুবার—বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এক এক সময় এমনো হয়েছে যে মনোনীত একটি বা একাধিক দৃশ্য হঠাৎ কী খেয়ালে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে নতুনভাবে তুলেছেন, এবং তা তুলতেও সময় অথবা ফিল্ম কিছুরই কার্পণ্য করেননি। অর্ধেক ছবি হয়ে গেছে, কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী—তা তিনি যত বড়োই হন না কেন—গোলমাল শুরু করেছেন, অথবা যেকোনো কারণেই হোক চ্যাপলিনের মনঃপূত হচ্ছে না—অমনি তিনি অগ্রপশ্চাৎ এতটুকু না ভেবে জবাব দিয়েছেন তাঁকে এবং গোড়া থেকে আবার শুরু করেছেন ছবি। এইরূপ নানা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে চলেছেন চ্যাপলিন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা পর্যন্ত তাঁর এই সমস্ত খেয়ালের মুখে কোনো কথা বলতে ভরসা পায়নি। কিন্তু এ যে শুধু চ্যাপলিনের নেহাতই খামখেয়ালি তা নয়। শিল্পের প্রতি এক প্রগাঢ় নিষ্ঠা তাঁকে এক এক সময় অসহিষ্ণু করে তুলেছে, চারদিক মানিয়ে-গুছিয়ে চলার কথা এতটুকু তিনি ভাবতে পারেননি। একটি আলিঙ্গনের দৃশ্যে শিল্পীদের আবেগের প্রতিটি অনুকরণকে স্পষ্ট করে ফোটাতে গিয়ে যেখানে পর পর একশবার আলিঙ্গনের নির্দেশ দিলেন এবং একশবারই ক্যামেরাকে চালু রাখলেন, সেখানে কোন্ সাহসে কে তাঁকে সেই কাজ থেকে বিরত করবে! CITY LIGHTS ছবিতে অন্ধ ফুলওয়ালীর সঙ্গে

ভবঘুরে চার্লির প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি তিনি তুললেন বহুবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমালোচকদের বারবার তা দেখালেন, এবং প্রতিবার নতুন করে আরো কয়েকবার দৃশ্যটাকে তুললেন। এক-আধটা ক্ষেত্রে নয়, প্রতি ছবিতেই চ্যাপলিন এই রকম করেছেন, এবং বাস্তবিকই এই নিষ্ঠা ছিল বলেই তাঁর শিল্পপ্রচেষ্টা এতখানি সার্থকতা পেয়েছিল।

এই সময়ে চ্যাপলিনের মধ্যে যে-জিনিসটা পরিষ্কার ফুটে উঠল তা হলো সত্যসন্ধানে তাঁর নিষ্ঠা। মাঝে মাঝেই দেখা যেত, কোনো রকম জানান না দিয়েই হঠাৎ ছবির নির্মাণ-কার্য বন্ধ করে দিয়ে চ্যাপলিন নিরুদ্দিষ্ট হতেন। সংগঠনের সংশ্লিষ্ট কর্মীরা যথারীতি স্টুডিওতে হাজিরা দিয়েই চলতেন, কিন্তু চ্যাপলিনের দেখা নেই। কয়েকদিন পরেই আবার দেখা গেল কোত্থেকে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েই নতুন উদ্যমে তিনি শুরু করে দিলেন ছবির কাজ। সদ্য-পাওয়া অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রয়োগ করলেন তাঁর নতুন কাহিনীতে। অবশ্য তা করতে গিয়েও সুবিধেমতো কাহিনীর আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তনও তিনি করলেন, এবং সেই সঙ্গে বাস্তবের অপূর্ব শিল্পায়নে আশ্চর্য রকম বলিষ্ঠ হয়ে উঠল বক্তব্য। এ ধরনের ঘটনা তাঁর কোনো বিশেষ ছবির ক্ষেত্রেই যে ঘটেছে তা নয়; এটাই ছিল চ্যাপলিনের স্বভাব, এবং তাঁর সমস্ত ছবির পেছনের এমনি ছোটখাটো ইতিহাসের নজির রয়েছে। বাস্তবিকই চার্লি চ্যাপলিন মুক্তকণ্ঠেই জানিয়েছেন যে বাস্তব-সত্য দর্শকের একান্ত কাম্য, শিল্পপ্রচেষ্টায় তাই বাস্তবের প্রয়োগ অপরিহার্য।

১৯২১ সালে THE KID ছবিটির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চ্যাপলিনের খ্যাতি প্রসারিত হলো চতুর্গুণ। গভীর মানবিক আবেদনে ভরা ছয় রিলের এই ছবিটি তাঁর অসামান্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতিশয়োক্তি এতটুকু নেই, বাড়তি উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে বিষয়বস্তুকে 'চাঞ্চল্যকর' করে তোলার কোনো অপচেষ্টাই নেই,—সহজ সুন্দর করে যা ফুটিয়ে তোলা হল তা হচ্ছে এই নিষ্ঠুর বাস্তব পরিবেশে মা-বাপহারা রাস্তায়-পড়ে-পাওয়া এক পরিত্যক্ত শিশু ও এক অনাদৃত ভবঘুরের দরদি কাহিনী—a Picture with a smile—Perhaps a tear. ছয় রিলের এই ছবিতে চ্যাপলিন

তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রেখেও একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্গতি ও বাঁধুনি আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্ল্যাপস্টিকের মাত্রা খানিকটা কমিয়ে দিয়ে ঘটনার মাঝে মাঝে আবহাওয়াকে অল্পবিস্তর ভারিক্কি করে তোলা হলো সত্যি, কিন্তু তাতে ছবির আবেদন বাড়ল বই কমল না। অবশ্য ছবিটি মুক্তির আগে সংগঠনের কোনো কর্মকর্তা এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এমন শোনা যায়, এবং চ্যাপলিন নাকি তাতে ঠাট্টার সুরে জানিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে ছবিতে একটা বিস্ফোরণ অথবা ওই জাতীয় একটা কিছু জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। যাই হোক, THE KID ছবিটির অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটাই আরো স্পষ্ট করে প্রমাণিত হলো যে মানবচরিত্রের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিকে গভীর দরদ, সীমাহীন সমবেদনা ও হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে শিল্পোত্তীর্ণ করে তুলতে চ্যাপলিনের মতো ঐন্দ্রজালিক পৃথিবীতে খুব কমই মেলে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শিশু-চরিত্রটির ভূমিকায় যে নবাগতটি অবতীর্ন হয়ে জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জন করল তার নাম জ্যাকি কুগান। চ্যাপলিনের আশ্চর্য শিক্ষার গুণে জ্যাকি কুগান পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ শিশু-অভিনেত্রী হিসেবে সম্মানিত হলো।

চ্যাপলিন সম্পর্কে যেমন নানা গল্প প্রচলিত আছে, তেমনি জ্যাকি কুগানের ছবিতে আসা নিয়েও একটা ভারি মজার গল্প চালু রয়েছে। গল্প কতখানি সত্যি তা একমাত্র চ্যাপলিনই বলতে পারেন, কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কিছু বলুন আর না-ই বলুন, নানা মুখে গল্পটা বেশ ছড়িয়ে গেছে। ঘটনাটা এই :

তখন ১৯১৯ সাল। চ্যাপলিন একদিন রাস্তা দিয়ে নিজের মনে হেঁটে চলেছেন, হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ছোট্ট একটি ছেলে রাস্তার এক কোণে বসে পথচারীর পায়ের সামনেটা তাক করে ছুড়ে মারছে একেকটা কলার খোসা। হয়তো ছেলেটির চেয়েও বেশি হুঁশিয়ার পথচারীরা। তাই আড়াল থেকে কলার খোসা ছোড়া সত্ত্বেও তারা কেউ আছাড় খাচ্ছে না, খোসা ডিঙিয়ে ছেলেটিকে হতাশ করে এগিয়ে যাচ্ছে। চ্যাপলিন ছেলেটির এই ব্যাপার লক্ষ করেন। THE KID ছবিটির আবছা আভাস

আগে থেকেই মাথায় ঘুরছিল, তাড়াতাড়ি ছেলেটির পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছোকরা, ছবিতে নামবে?'

বিজ্ঞের মতো ছেলেটি জবাব দিল, 'ভেবে দেখতে পারি।'

চ্যাপলিনের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। বললেন, 'চলো, তোমার বাবার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে।'

—'তার দরকার হবে না। আমার বয়সটা নেহাত কম নয়। পাঁচ বছর। আমার সঙ্গে আলোচনা করলেই চলবে।'

বলা বাহুল্য, ছেলেটির এই পাকামি চ্যাপলিনের খুব ভালো লেগেছিল, এবং দুবছর পরে চ্যাপলিনের শিক্ষা পেয়ে এই ছেলেটিই হয়ে উঠল জগৎ-বিখ্যাত জ্যাকি কুগান।

কেনিংটন বস্তির লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার অনেক কিছুই আবেগোচ্ছল হয়ে ফুটে উঠল THE KID ছবিতে। শুরুতেই দেখা গেল এক দাতব্য হাসপাতাল থেকে একটি শিশু কোলে বেরিয়ে আসছে এক মহিলা। মহিলার একমাত্র অপরাধ যে সে মা, জারজ সন্তান বুকে করে সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গির্জার সামনে এসে দাঁড়াতেই মহিলাটি দেখতে পেল এক অর্থবান বৃদ্ধ বর তরুণী কনেসহ নামলেন গাড়ি থেকে। এই সুযোগে মহিলাটি তাড়াতাড়ি ছোট একটা কাগজে কী যেন লিখে শিশুটির গলায় লটকে দিয়ে শিশুটিকে সযত্নে শুইয়ে দিল গাড়িটার পেছনের গদিতে। তারপর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দিল। ইতিমধ্যে একদল চোর এসে গাড়িটাকে নিয়ে পালাল। কিছুদূর এসে শিশুটাকে দেখতে পেয়ে রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে তারা গাড়ি হাঁকিয়ে অদৃশ্য হলো। ঠিক এই সময় ওই পথ দিয়ে আসছিল ভবঘুরে চার্লি। আবর্জনার কাছাকাছি আসতেই পাশের বাড়ির দোতলার জানালা থেকে এক গাদা নোংরা পড়ল চার্লির মাথার ওপর। ব্যাপারটা সমঝে নেওয়ার জন্য চার্লি একটু দাঁড়াতেই আবর্জনার স্তূপের মধ্য থেকে একটা বাচ্চার কান্না শুনতে পেল। আবর্জনা সরিয়ে বাচ্চাটাকে চার্লি তুলে নিল, এবং তেমন কিছু না ভেবেই রাস্তার আর একটি গাড়ির মধ্যে অন্য একটি বাচ্চার পাশে একে শুইয়ে দিল। সঙ্গে

সঙ্গে গাড়ির ভেতরে এক মহিলা ঘোর আপত্তি তুলল, এবং ফলে চার্লি আবার তাকে কোলে তুলে নিতে বাধ্য হলো। মহা মুশকিল! নানা ফিকিরফন্দি করেও চার্লি বাচ্চাটাকে আর কারো হাতে গছাতে পারছে না এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের দাবড়ানি খেয়ে বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হলো। একবার ভাবল ফেলে দেবে নাকি আপদটাকে খানার ভেতরে! কিন্তু পরক্ষণেই চার্লির নজর পড়ল গলায় লটকানো লেখাটার প্রতি। লেখা রয়েছে—'শিশুটির প্রতি দয়া পরবশ হউন!' সাতপাঁচ ভেবেও চার্লি কিছু করতে পারল না, বাচ্চাটাকে নিজের করে নিতেই হলো।

এদিকে জারজ সন্তানের মা সন্তান হারিয়ে আত্মহত্যার উদ্যোগ করছে। উঁচু একটা সাঁকো থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে, ঠিক এমন সময় একটি শিশু আয়ার নজর এড়িয়ে থপ থপ করে হাঁটতে হাঁটতে জড়িয়ে ধরেছে তার পা। সমস্ত মাতৃস্নেহ উপছে উঠল তার। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না, ছুটে গেল সেই গির্জার কাছে, সেখানে গিয়ে জানতে পারল যে, মোটরগাড়িটাকে একদল দুর্বৃত্ত চুরি করেছে।

ওদিকে চার্লি তার ডেরায় ফিরে এল, সঙ্গে পড়ে-পাওয়া সেই শিশুটি। বস্তির নোংরা পরিবেশে প্রাণভরা ভালোবাসা দিয়ে চার্লি শিশুটিকে আগলে রাখল, এবং এমনি করে পাঁচটা বছর কাটল।

প্রাণ–ধারণের জন্য নানা রকম ফিকিরফন্দি খুঁজতে হলো ভবঘুরে চার্লিকে। পাঁচ বছরের জ্যাককে সাগরেদ করে চার্লি বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। ঠিক হলো, আড়াল থেকে বড়লোকের বাড়ির জানালার সার্সিগুলো ইট মেরে জ্যাক ভেঙে ফেলবে, আর তারপরেই চার্লি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে ভাঙা সার্সি সারানোর নাম করে। খাসা ব্যবস্থা! কিন্তু বাপ-বেটার গতিবিধি পুলিশের নজর পড়ল না। নানা কায়দায় পুলিশের আঁচ বাঁচিয়ে তারা ফিরে এল বস্তিতে।

এই ক'বছরে জারজ সন্তানের মার জীবনে মস্ত পরিবর্তন ঘটেছে। থিয়েটারের মস্ত গাইয়ে হয়েছে সে, চারদিকে নামডাক। কিন্তু এত খ্যাতি, এত অর্থকড়ি থাকা সত্ত্বেও তার মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠত প্রতি

মুহূর্তেই। তাই সে বাইরের সবকিছুর আড়ালে নিজেকে একান্তভাবে ডুবিয়ে রেখেছিল বস্তির গরিব শিশুদের সেবায়।

নানা ঘটনা, নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে চার্লি আর জ্যাকের দিন কাটছে। চার্লি তার সমস্ত সত্তা দিয়ে আগলে রাখছে নাম-গোত্রহীন শিশুটিকে। জ্যাকও পৃথিবীতে তার 'বাবাকে' ছাড়া আর কাউকেই জানে না, আর কাউকেই সে পরোয়া করে না। একদিন কোনো কারণে বস্তির এক সমবয়সী ছেলের সঙ্গে জ্যাকের ঝগড়া লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত ঝগড়া এসে দাঁড়াল হাতাহাতিতে। মারামারিতে জ্যাক হেরে গেল, বেশ খানিকটা জখমও হলো সে। ঘটনাচক্রে থিয়েটার গাইয়ে তখন বস্তিতে ঘুরছিল, জ্যাককে সে কোলে তুলে নিয়ে চার্লির কাছে এলো। বলল, এখুনি ডাক্তার ডাকতে হবে। ডাক্তার এলো, ওষুধপত্তরের একটা ব্যবস্থাও হলো। অবশ্য ব্যবস্থা সবকিছুই সম্ভব হলো দয়াবতী গায়িকার জন্যই।

ডাক্তার কিন্তু একটুতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে শিশুটি চার্লির নিজের নয়, এবং এটা বুঝতে পেরে চার্লিকে না জানিয়েই থানায় ডায়েরি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনাথ-আশ্রমের গাড়ি নিয়ে পুলিশ হাজির হলো, ছেলেটিকে জমা দিতে হবে আশ্রমে।

এ এক অসম্ভব প্রস্তাব। চার্লি আর জ্যাক দুজনেই রুখে দাঁড়াল। ধস্তাধস্তি, দৌড়াদৌড়ি খানিকক্ষণ চলল, তারপর টেনেহিঁচড়ে পুলিশ জ্যাককে টেনে তুলল অনাথ-আশ্রমের গাড়িতে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল, আর জ্যাক মরিয়া হয়ে হাত-পা ছুড়তে লাগল।

এদিকে ছাদের পর ছাদ ডিঙিয়ে পুলিশকে ঠকিয়ে চার্লি লাফিয়ে পড়ল চলন্ত গাড়ির ছাদে, তারপর আশ্রমের কর্তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে জড়িয়ে ধরল হারানো ছেলেকে। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দেখল চার্লির বুকে লেপটে রয়েছে জ্যাক, দু'জনেরই গাল বেয়ে জল ঝরছে।

ওদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে দুজনে আশ্রয় নিল ছোটখাটো একটা সরাইখানায়। সেখানেও অবশ্যই খাবারের পয়সা মেটাতে ঝামেলা কম পোহাতে হলো না। তার ওপর, সরাইখানার মালিকের

নজর পড়ল খবরের কাগজের এক বিজ্ঞাপনের প্রতি—কোনো এক হারানো ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য ছেলের মা—থিয়েটারের এক বিখ্যাত গায়িকা—বেশ মোটা অঙ্কের এক পুরস্কার ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে ছেলেটির বুকে লটকানো ওই লেখাটি ডাক্তার চার্লির ডেরা থেকে সরিয়ে নিয়ে গায়িকাকে দেখাতেই সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কাগজে ওই রকম বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কাগজে ছাপানো ছবিটার সঙ্গে ঘুমন্ত জ্যাকের চেহারা মিলিয়ে নিয়ে কালবিলম্ব না করে সরাইখানার মালিক চুপিচুপি ছেলেটিকে সোজা থানায় নিয়ে তুলল। থানা থেকে গায়িকাকে খবর দিতেই ছুটে এল, হারানো ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

ওদিকে ঘুম থেকে উঠে চার্লি জ্যাককে না দেখে পাগলের মতো ঘুরতে লাগল। সমস্ত রাত রাস্তাঘাট, অলি-গলি খুঁজেও ছেলের কোনো পাত্তা পেল না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে চার্লি ফিরে এল তার পুরোনো বস্তিতে। দরজার সামনে বসে পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চার্লি স্বপ্ন দেখল যেন নোংরা বস্তিটা আর নেই। সারা তল্লাটটা যেন হয়ে গেছে পরীর দেশ। সকলেরই পাখা গজিয়েছে, সবাই উড়ছে—এমনকি বস্তির ওই নেড়ি কুকুরটাও। চারদিকে বিরাজ করছে শান্তি আর প্রাচুর্য। আর সেই স্বর্গীয় পরিপূর্ণতার মধ্যে জ্যাক যেন এসে দাঁড়িয়েছে চার্লির সামনে। এ হেন স্বর্গরাজ্যেও হঠাৎ কোত্থেকে হানা দিল শয়তানের চেলা চামুণ্ডারা। এসেই তারা বাধিয়ে দিল একটা হট্টগোল। হট্টগোলে চার্লির ঘুম গেল ভেঙে, তাকিয়ে দেখল পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে। গলা ধরে পুলিশ চার্লিকে টেনে তুলল একটা গাড়িতে। গাড়ি ছেড়ে দিল ! চার্লি কিছুই ঠাহর করতে পারছে না, কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুলিশ যখন চার্লিকে এক মস্ত বাড়ির গৃহিণীর দরবারে পৌঁছে দিল তখন দেখা গেল যে গৃহিণী অর্থাৎ থিয়েটারের সেই দয়াবতী গাইয়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হারানো ছেলে জ্যাক। চার্লি সাদরে গৃহীত হলো সেই বাড়িতে। ছেলে তো আনন্দে আত্মহারা।

ফার্স্ট ন্যাশনাল সারকিটের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ তখনো ফুরিয়ে যায়নি। এমনি সময়ে ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে চ্যাপলিন স্টুডিওতে এসে হঠাৎ তার সহকর্মীদের জানালেন যে অবিলম্বে তাঁকে ইউরোপে যেতে হবে। তাঁর বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। তখন স্টুডিওতে নতুন ছবির তোড়জোড় চলছিল, কিন্তু চ্যাপলিন যখন একবার মনস্থির করে ফেলছেন তখন আর অন্যথা হওয়ার নয়। সহকর্মীরা ছবির কাগজপত্তর তলপিতলপা গুটিয়ে রাখলেন এবং পরের দিন রাতেই চ্যাপলিন নিউইয়র্ক অভিমুখে রওনা হলেন।

নিউইয়র্কে কয়েকটা দিন চ্যাপলিনের কাটল পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে, সাংবাদিক বৈঠকে আসর জমিয়ে, উকিলের সঙ্গে একাধিক মামলার আলোচনায় ব্যাপৃত থেকে এবং দু'চারটে নাটক দেখে। কবিবন্ধু কার্ল স্যান্ডবার্গ, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, মারি পিকপোর্ড, বামপন্থী পত্র-পত্রিকা Liberator- এর সম্পাদক ম্যাক্স ইস্টম্যান* এবং আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে চ্যাপলিনের এই সময়ে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সাংবাদিকের দল চ্যাপলিনকে প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ করে তোলেন। নানাভাবে নানা প্রশ্ন করেন। এমনকি একজন প্রশ্ন করে বসেন যে তিনি বলশেভিক কি না। জবাবে চ্যাপলিন বললেন, I am an artist, I am interested in life. Bolshevism is a new phase of life. I must be interested in it. জবাবটা যে শুধু স্পষ্ট ও অনাড়ম্বর তাই নয়। এর মধ্য দিয়ে শিল্পী চ্যাপলিনের জীবনদর্শন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষিত হলো।

ইউরোপের পথে জাহাজেও চ্যাপলিনকে নিয়ে অনেক হইচই হলো। জাহাজে কোনো এক রুশ ভদ্রলোক নাকি চ্যাপলিনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তাঁর মতে কে বড়ো—লেনিন না লয়েড জর্জ[0]! ছোট

---

* পরবর্তীকালে ম্যাক্স ইস্টম্যান 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকার সম্পাদক এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল।

[0] গত প্রথম মহাযুদ্ধে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লয়েড জর্জ।

কথায় জবাব হলো, 'One works, another plays.'

গত সাত বছরের সিনেমা-জীবনে চ্যাপলিনের জনপ্রিয়তা এমনি বিরাট আকার ধারণ করেছিল যে ১৯২১ সালে ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে যেখানেই গেলেন সেখানেই তিনি সংবর্ধনা পেলেন অস্বাভাবিক রকমের। প্রভূত সম্মানে ভূষিত হলেন চ্যাপলিন।

সোভিয়েত চিত্রপরিচালক সার্জি আইজেনস্টাইনের ভাষায় চ্যাপলিনের এই ইউরোপ সফর একমাত্র গত শতাব্দীতে চার্লস ডিকেন্সের আমেরিকা সফরের সমতুল্য। লন্ডনের পথেঘাটে তুমুল উত্তেজনা, সকলেরই গর্বে বুক ফুলে উঠল অনেকখানি। প্যারিসেও তাই, চ্যাপলিনের আগমনে সমস্ত শহরে অস্বাভাবিক সাড়া পড়ে গেল। বার্লিন যুদ্ধের আগে যদিও চ্যাপলিনের ছবি তেমন দেখানো হয়নি, তবু আসার দু-চার দিনের মধ্যেই চারদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে গেল, জনসাধারণ তাঁকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। অভিনেত্রী পোলা নেগ্রির সঙ্গে চ্যাপলিনের পরিচয় এই সময়েই। দুজনের মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হতে দু-চার দিনের বেশি সময় লাগল না। প্যারিসে ও ব্যার্লিনে বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে চ্যাপলিনের পরিচয় হলো, নানা বিষয়ে নানা আলোচনা হল! সাধারণ্যে ও বিদগ্ধ সমাজে এই দুই মহলেই সমানভাবে সমাদৃত হলেন চ্যাপলিন। লন্ডনে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এইচ. জি. ওয়েলস–এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। ওয়েলস-চ্যাপলিনের নানা বিষয়ে আলোচনা হল—শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি।

বেশির ভাগ সময়েই চ্যাপলিন ঘুরে বেড়ালেন লন্ডনের সেই সমস্ত পল্লীতে যেখানে রয়েছে তাঁর বৈচিত্র্যময় ছেলেবেলার লাঞ্ছিত জীবনের স্বাক্ষর। অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতায় গভীর অনুভূতিতে আকুল হয়ে উঠল শিল্পীর মন এবং স্বভাবতই এক অব্যক্ত প্রেরণার ঝলকানিতে তাঁর শিল্পীমন জাগ্রত হয়ে উঠল। রাস্তার মানুষ তাঁকে চিনে ফেলবে এই ভয়ে চ্যাপলিন পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সেই সমস্ত জায়গায়—কেনিংটন বস্তিতে, পার্কে, অলিতে-গলিতে। ল্যাম্বেথে অবস্থিত তিন নম্বর প্যানাল টেরাসের অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তিনি উঠলেন দোতলার সেই

ছোট খুপরিটিতে, যেখানে ছেলেবেলাকার কয়েকটা বছর কাটাতে হয়েছে মা আর দাদার সঙ্গে। সেখানে দীন-দরিদ্র ভাড়াটেদের সঙ্গে গল্প করেছেন, তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনেছেন, কেমন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাঁর মনপ্রাণ। কেনিংটন পার্কে আত্মবিস্মৃত হয়ে বসে রয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পায়ে পায়ে হেঁটেছেন এই গলি থেকে ওই গলিতে। আমেরিকায় ফিরে গিয়ে 'My Trip Abroad' বইতে চ্যাপলিন গভীর দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন তাঁর মনের কথাগুলো। এতটুকু ফাঁক ছিল না বলেই কথাগুলোকে এত স্পষ্ট করে, এত সুন্দর সহজ করে তিনি বলতে পেরেছিলেন। লন্ডনে নামতেই তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর প্রথম বয়সের প্রেমিকা হেটি কেলির কথা। অনুসন্ধান করে তিনি জানলেন যে দুই বছর আগে সে মারা গেছে। কেনিংটন পার্কে তিনি বসে রইলেন নিজেকে ভুলে গিয়ে। মনে হলো যেন উনিশ বছরের যৌবন তিনি ফিরে পেয়েছিলেন, যেন হেটি কেলির জন্যই তিনি আজ অপেক্ষা করে রয়েছেন। কিন্তু দিন গড়িয়ে গেছে অনেকখানি। কত লোক আসে সেখানে, কত মানুষ—ছেলে, বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ অনেকে। এল না শুধু হেটি। হেটি নেই, উনিশ বছরের সেই যৌবনোচ্ছল চার্লিও নেই।

কেনিংটন পার্কে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে যে-কথাটা চ্যাপলিনের মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখল তা হলো ছেলেবেলাকার সেই রাস্তার অন্ধ গাইয়ের গান—'You are my honey, honey suckle' এ সম্পর্কে তিনি তাঁর 'My Trip Abroad' বইতে লিখেছেন,—

I was here that I discovered music, or where I first learned its rare beauty, a beauty that had gladdened and haunted me from that moment. It all happend one night when I was there. I recall the whole thing so distinctly. I was just a boy, and its beauty was like some sweet mystery. I did not understand. I only knew I loved it and it became reverent as the sounds carried themselves through my brain via my heart.

ছেলেবেলাকার এই অনুভূতি এতই প্রবল ও গভীর হয়ে উঠেছিল যে আজ এই বৃদ্ধ বয়সেই তিনি সেই সাত বছর বয়সের কথা এতটুকু ভুলতে পারেননি। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে এসে নিউজ ক্রনিকলের এক সাংবাদিকের কাছে তিনি এই কথাই আবার নতুন করে বলতে গিয়ে বলেছেন, '... ধীরে ধীরে গানটা শেষ হয়ে গেল। এক গভীর বেদনায় আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, কাঁদতে কাঁদতে আমি বাড়ি ফিরলাম। তখন আমার সাত বছর বয়স, আর আজ আমি তেষট্টি বছরের বৃদ্ধ। কিন্তু সেই দিনের কথা আমি কখনো ভুলতে পারব না।'

গানের মতোই কতশত জিনিস চ্যাপলিন আবিষ্কার করেছেন ছেলেবেলায় এক দুঃসহ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে। My Trip Abroad বইতে নিখুঁতভাবে তাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আগেকার সেই অন্ধ বুড়ো ভিখিরিকে চ্যাপলিন দেখলেন ল্যাম্বেথের রাস্তায়। সেই লোক, সেই বুড়ো, কিন্তু সাত বছরের আরো খানিকটা বুড়িয়ে গেছে। আর তারই সঙ্গে সাত বছরে আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে পারিপার্শ্বিকতা। চ্যাপলিন লিখেছেন,—

'To me it is all too horrible. He is the personification of poverty at its worst, sunk in that inertia that comes of lost hope. It is too terrible.'

রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিষ্পাপ কচি কচি মুখগুলো দেখে চ্যাপলিন অধীর হয়ে উঠলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন—

'As I pass, they look up. Farnkly and without embarrasment they look at the stranger with their beautiful kindly eyes. They smile at me, I smile back. Oh, if only I could do something for them! These waifs with scarcely any chance at all.

এমনি করে চ্যাপলিন লোক-চক্ষুর অন্তরালে বহির্জগতের সমস্ত রকম হইচই মাতামাতি এড়িয়ে বেশির ভাগ সময় পাগলের মতো ঘুরে

বেড়ালেন এক অপূর্ব অনুভূতির আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে। রাস্তার নোংরার মধ্যে তিনি খুঁজে বেড়ালেন মানুষকে। অবশ্য মাঝে মাঝে রাস্তার লোকের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেছেন, ধীরে ধীরে অনেক লোক জমে যেতেই পুলিশের সাহায্য নিয়ে পালাতে হয়েছে তাঁকে।

বার্নার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করবেন মনস্থ করে তাঁর দরজা পর্যন্ত গিয়ে চ্যাপলিন ফিরে এলেন। সঙ্গীকে বললেন, 'দেখা তো সবাই করছে! কিন্তু তাদের অনুকরণ করতে চাই না। আমি আমার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলব। বার্নার্ড শ' আগে আমাকে পছন্দ করুন, তবে তো! আগে থেকেই ভদ্রলোকের ওপর আমাকে চাপিয়ে দিতে আমি নারাজ। ওঁর সঙ্গে দেখা করা এখন চলতেই পারে না।' চ্যাপলিনের সঙ্গে বার্নার্ড শ'র দেখা হয় এরও দশ বছর পরে—১৯৩১ সালে। এই সাক্ষাৎকারের পর বার্নার্ড শ' চ্যাপলিন সম্পর্কে মন্তব্য করেন,—'The only genious developed in motion pictures'

কয়েক মাস ইউরোপে কাটিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে চ্যাপলিন আমেরিকায় ফিরে এলেন। My Trip Abroad বইয়ের কাটতি হলো অস্বাভাবিক রকমের, খরচ–খরচা বাদ দিয়ে চ্যাপলিনের ভাগে এল মোটা টাকার অঙ্ক।

*　　*　　*

ইউরোপে যাওয়ার আগে দুই রিলের যে ছবিটি চ্যাপলিন শেষ করেছিলেন তার নাম THE IDLE CLASS। ছবিটি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয় চ্যাপলিনের ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে; ইউরোপ থেকে এসেই তিনি পরপর যে দুখানা ছবি তোলেন সে ছবি দুটির নাম যথাক্রমে PAY DAY (দুই রিল) ও THE PILGRIM (চার রিল)। উপরোক্ত তিনটি ছবিতেই এডনা প্রধান স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেন, যদিও তিনটির একটিও চ্যাপলিনের পূর্ববর্তী কয়েকটি ছবির কাছে দাঁড়াতে পারল না। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এবং আঙ্গিকগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে ছবিগুলো দর্শকমন আকৃষ্ট করতে সমর্থ হলো না।

THE PILGRIM ছবিটি শেষ হতেই চ্যাপলিনের সঙ্গে ফার্স্ট ন্যাশনাল সারকিটের আটখানা ছবি তৈরি করবার চুক্তি পূর্ণ হলো। চ্যাপলিন এবার ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, মারি পিকফোর্ড ও বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক ডি. ডব্লিউ. গ্রিফিথের সঙ্গে যোগ দিলেন! চারজন মিলে এক নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন—নাম 'ইউনাইটেড আর্টিস্টস'। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে চ্যাপলিন যে আটখানা অসাধারণ ছবি করেছেন সব কটাই তিনি করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের হয়েই। ১৯৫২ সালে তাঁর শেষ ছবি LIMELIGHT-এর পরে আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনে এক বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলেই চ্যাপলিনকে পরে 'ইউনাইটেড আর্টিস্ট'-এর সমস্ত স্বত্ব বিক্রি করে সুইজারল্যান্ডে নতুন আস্তানা বানাতে হলো। আমেরিকার রাষ্ট্রীয় কর্তাদের দ্বারা সৃষ্ট এই বিশেষ পরিস্থিতি দেখা না দিলে হয়তো তেষট্টি বছর বয়সে তিনি তাঁদেরই হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে আসতে পারতেন না,—প্রযোজনা, পরিচালনা, পরিবেশন ইত্যাদি অর্থাৎ ছবি তৈরি ও প্রদর্শনের যাবতীয় ব্যবস্থার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে ১৯২৩ সাল থেকে চ্যাপলিন ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আটখানা বড়ো বড়ো ছবির মারফত যে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন তা বাস্তবিকই স্বপ্নাতীত। এই উনত্রিশ বছরের বিরাট শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে চ্যাপলিন জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত পৃথিবীকে হাসালেন, কাঁদালেন—সমস্ত পৃথিবীর হৃদয় জয় করলেন,—এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের একজন বলে পরিগণিত হলেন।

চ্যাপলিন–পরিচালিত 'ইউনাইটেড আর্টিস্টস'–এর প্রথম ছবির নাম A WOMAN OF PARIS—চ্যাপলিনের শিল্পনৈপুণ্যের ও গভীর জীবনবোধের এক অভিনব দৃষ্টান্ত। আট রিলের এই ছবিটি প্রথম দেখানো হয় ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে। চ্যাপলিনের সিনেমা–জীবনে এইটিই একমাত্র ছবি, যেখানে তিনি নিজে কোনো ভূমিকায় নামলেন না এবং যা কমেডি না হয়ে হলো ট্র্যাজেডি। তা ছাড়া একটানা নয় বছর ধরে চ্যাপলিনের প্রতিটি ছবির সঙ্গে জড়িত থাকার

পরে এই ছবিতে এডনা শেষবারের মতো প্রধান স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এবং বলা বাহুল্য অভিনয়ে এডনা অশেষ দক্ষতা দেখান। জটিল মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের নিপুণ সংস্থাপনে ছবিটি নিঃসন্দেহে সিনেমাশিল্পে এক নতুন স্টাইলের প্রবর্তন করল। গতানুগতিকতার দেয়াল ভেঙে নতুন ছাঁচে গড়তে হলো বলেই ছবির শুরুতেই ছোটখাটো একটা জবানবন্দি চ্যাপলিনের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ল। জবানবন্দিতে চ্যাপলিন জানালেন,—

'Humanity is composed not of heroes and villains but of men and women and all their passions, both good and bad, have been given them by God. They sin only in blindess and the ignorant condemn their mistake, but the wise pity them.'

নতুন ভাবধারা ও নিপুণ আঙ্গিকের প্রয়োগে, বক্তব্যের প্রাঞ্জলতায় ও বলিষ্ঠতায় এবং সর্বোপরি সামাজিক মূঢ়তার প্রতি তীব্র কটাক্ষে A WOMAN OF PARIS সে-যুগের সেরা ছবির আসরে সম্মানিত স্থান পেত।

আতিশয্য-বর্জিত এই বিয়োগান্ত কাহিনীর শুরু হলো ফ্রান্সের এক স্নিগ্ধ শান্ত গ্রাম্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে। গভীর রাতে মারি নামে ওই গ্রামেরই এক মেয়ে তার দোতলার ঘরে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছে, নিচে রাস্তায় অপেক্ষা করছে তার প্রেমাস্পদ জঁ। মারির বাবা ছেলে-মেয়ের এই অবৈধ মিলনের ঘোর বিরোধী। তালাচাবি দিয়ে তাই তিনি তাঁর মেয়েকে আটকে রেখেছেন ঘরের মধ্যে। কিন্তু জঁ ও মারি দুজনেই মরিয়া হয়ে উঠেছে, জানালা টপকে দেয়াল বেয়ে মারিকে জঁ নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। ফল দাঁড়াল এই যে, চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ির দরজা মারির সামনে বন্ধ হয়ে গেল। জঁ মারিকে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে, কিন্তু সেখানেও বাবা-মায়ের বিরোধিতায় দুজনকেই বেরিয়ে আসতে হলো। ঠিক হলো সেই রাতেই দুজনে প্যারিসে চলে যাবে, সেখানে বিয়ে করে তারা তাদের নতুন পৃথিবী রচনা করবে। মারিকে

স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে জঁ বাড়িতে ফিরে এল জিনিসপত্তর গোছগাছ করতে। ছেলের এই নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহারে বাবা উত্তেজনায় জ্ঞান হারালেন, বিছানা-পত্তর নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও ছেলের বেরোনো শেষ পর্যন্ত আর হলো না। সবকিছুই যেন কিছুক্ষণের মধ্যে কেমন গুলিয়ে গেল। বাড়িতে হইচই, ডাক্তার, ওষুধপত্তর ইত্যাদি। আর স্টেশনের প্লাটফর্মে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া মারি। প্যারিসগামী ট্রেনের আলোকিত কামরাগুলোর ছায়া মারির মুখের ওপর দিয়ে সরে যেতে লাগল।

এক বছর পরে প্যারিস নগরী।

Paris—the magic city, where fortune is fickle and a woman gambles with life.'

অভিজাত কর্তাব্যক্তিদের খামখেয়ালির ফলে মারি আজ আর সেই সহজ সরল গ্রাম্য মেয়েটি নেই, প্যারিসের চোখ-ঝলসানো মন-ধাঁধানো কেতাদুরস্ত কেন্দ্রগুলোর মক্ষিরানী সে। শহরে বিত্তশালী পুরুষেরা আজ তাকে ঘিরে সাময়িক ফুর্তির স্বপ্নে মশগুল, তার এতটুকু অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় তারা আজ ব্যাকুল। মারি অনুগ্রহ বিতরণ করে বেড়ায় কামাতুর পুরুষদের, আর নারী জীবনের এক প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতার মধ্যে সময় কাটায় সমগোত্রীয় নিশাচর সঙ্গিনীদের নিয়ে।

প্যারিসের সবচেয়ে অর্থবান পুরুষ পিয়ের মারিকে প্রেম নিবেদন করল। মারি অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যান করল না। অল্প সময়ের মধ্যে পিয়েরের প্রতি মারির একটা আন্তরিক ভালোবাসা গড়ে উঠল! কিন্তু স্বভাবতই পিয়ের সেই ভালোবাসার সম্মান দিতে নারাজ। ভালোবাসার ভান করে যথারীতি সে প্রমীলার রাজ্যে ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল। মারি বুঝল এই জীবন ! তার মতো পতিতার এ–থেকে পার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। পিয়েরকে ছেড়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সে অগাধ টাকার মালিক। অথচ ভালোবাসার প্রতিদান পাওয়ার আশাটাও নিতান্তই মরীচিকার পেছনে ছোটার শামিল। এমনি অবস্থায় হঠাৎ একদিন মারির সঙ্গে জঁ-র দেখা হলো। জঁ তার মায়ের সঙ্গে প্যারিসে

এসেছে আর্টকে স্থায়ীভাবে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে বলে। দুজনেই অবাক—মারি ও জঁ। এমনি করে তাদের আবার দেখা হবে দুজনের কেউই ভাবতে পারেনি। জঁ জানাল যে সেই রাতেই তার বাবার অকস্মাৎ মৃত্যুর ফলেই তাঁদের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। জঁ বিস্মিত হলো মারির এই ঐশ্বর্যে। মারির আড়ম্বর-বহুল জীবন জঁ-কে অবাক করে দিল, আর জঁ-র দারিদ্র্যের আন্দাজ পেয়ে মারি আন্তরিকভাবেই ব্যথিত হল। মারির ছবি আঁকতে গিয়ে জঁ এঁকে বসল সেই পুরোনো মারিকে—ছিন্ন-বসনা গ্রামীণ মারি। মারি জিজ্ঞেস করল, 'অতীতকে টেনে আনা কেন?' জঁ বলল, 'ওটাকেই যে আমি জানি ভালো।'

এই থেকেই শুরু হলো এক ত্রিকোণ সম্পূর্ণ। জঁ, মারি ও পিয়ের নিয়ে নানা ঘটনা তৈরি হলো, নানা নাটকীয়তার সৃষ্টি হলো। একদিকে পিয়ের দাঁড়াল তার ঐশ্বর্যের বলে বলীয়ান হয়ে—এক দুঃসাহসিক আত্মপ্রত্যয় নিয়ে, অন্যদিকে জঁ তার পুরোনো সমস্ত স্মৃতির মাধুর্যে এসে দাঁড়াল মারির একেবারে কাছাকাছি। কিন্তু জঁ-র মা এসে দাঁড়াল মাঝখানে। এই চূড়ান্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত জঁ আত্মহত্যা করল।

জঁ-র মা ছুটে গেল রিভলবার নিয়ে, মারিকে খুন করে সে তার প্রাণাধিক প্রিয় ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। গিয়ে অবশ্য তার প্রতিশোধ নেওয়া হলো না। সে দেখল শবের পাশে দাঁড়িয়ে মারি। গাল বেয়ে অবিরাম জল ঝরছে। ধীরে ধীরে মা'র হাত থেকে রিভলবারটা খসে পড়ল মাটিতে।

কিছুদিন গত হলো। ছোট্ট এক শান্ত স্নিগ্ধ পল্লী। এক অনাথ-আশ্রমে অনেকগুলো শিশুর মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্ন্যাসিনী মারি। প্রসন্নতার দীপ্তি মারির চোখেমুখে।

প্যারিসগামী রাস্তা। পিয়ের তার এক পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে তীব্র বেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে। উল্টোদিক থেকে মৃদুমন্দ গতিতে আসছে খড়ের বোঝা নিয়ে একটা গরুর গাড়ি। গাড়োয়ান আপন মনে অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে চলেছে। তারই পেছন পেছন দেখা যাচ্ছে মারি অনাথ-আশ্রমের

এক শিশুর হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে। মোটর গাড়িতে পিয়েরের বন্ধু পিয়েরকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ভালো কথা, মারির শেষ পর্যন্ত কী হলো?' 'পিয়ের কোনো জবাব দিল না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শুধু একবার ঘাড়টাকে দুলিয়ে নিল। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান মারি আর বাচ্চাটিকে গাড়িতে তুলে নিল,—আপন মনে যন্ত্রটি বাজিয়ে চলল। ধুলো উড়িয়ে পিয়েরের গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। গোরুর গাড়িটা উল্টোদিকে ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

এই গল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে জিনিসটি তা হচ্ছে ভবঘুরে চার্লির অনুপস্থিতি। চ্যাপলিনের শিল্পজীবনে একটাই একমাত্র ছবি যেখানে তিনি নিজে অভিনয় করেননি এবং যেখানে বিশ্ব-বিশ্রুত ভবঘুরে চরিত্রটি একবারের জন্যেও আসেনি। এহেন গুরু-গম্ভীর বিয়োগান্ত কাহিনীতে Chaplinesque অ্যাকশন ও ম্যানারিজম্–এর প্রয়োগ স্বভাবতই যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নয় বলেই চ্যাপলিন এই ছবিটাকে সাজিয়েছেন নতুন কায়দায়, নতুন স্টাইলে। ছোটখাটো টুকিটাকি এমন ঘটনা যদি কখনো এসে পড়েছে যেখানে ওই ধরনের অ্যাকশন বা ম্যানারিজম্ রীতিমতো মানানসই হয়ে উঠেছে, সেখানে ঘটনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তা তিনি করেছেন এবং চ্যাপলিনের অন্যান্য ছবিতে দর্শক যেমন হেসেছেন এই ছবিতেও অনুরূপ অবস্থায় তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু সাধারণভবে চিত্রনাট্য ও চিত্রগ্রহণের পদ্ধতি মূলত স্বতন্ত্র হওয়ার দরুন বাস্তবিকই তা তৎকালীন যুগে সংশ্লিষ্ট শিল্প মহলে এক সাড়া এনে দিয়েছিল। তদুপরি মাঝে মাঝে প্রতীক (Symbols) ও অন্যান্য অর্থপূর্ণ টুকরো টুকরো ছবির (imagery) সংযত ও সুপরিকল্পিত প্রয়োগ সামগ্রিকভাবে সুন্দর ও বলিষ্ঠ আর্টফর্ম হিসেবে সিনেমায় মর্যাদা বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দিল ! বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে আজকের সিনেমা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই তুলনায় A WOMAN OF PARIS- কে হয়তো কেউ খানিকটা সেকেলে মনে করতে পারেন, কিন্তু সিনেমা আর্টের ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

A WOMAN OF PARIS একদিকে যেমন অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করল, অন্যদিকে তেমনি নীতিবাগীশদের মহল থেকে যথেষ্ট নিন্দিতও হলো। নীতিবাগীশদের মতে ছবিটি পরোক্ষভাবে সামাজিক দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিন্দার মাত্রাটা এতই চড়ে গেল, যার ফলে পেনসিলভানিয়া স্টেটে ছবিটির প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলো। সরকারের তরফ থেকে যুক্তি দেখানো হলো, ছবিটি অশ্লীল ও নীতি-বিরুদ্ধ এবং এতে প্যারিসে বেশ্যাবৃত্তি ও অবৈধ প্রণয়ের অবতারণা করা হয়েছে। চ্যাপলিনের ছবির ওপর সরকারি জুলুম বোধ হয় এই প্রথম।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে বেশির ভাগ মহল থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়ে চ্যাপলিন এই ধরনের ছবি জীবনে আর কখনো করলেন না। শোনা যায় চ্যাপলিনের মতে ছবিটি নাকি এত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। জনৈক সমালোচকের প্রশ্নের জবাবে নাকি তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, গল্প শেষ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই নায়িকা মারি যে আশ্রম থেকে পালিয়ে আসবে না এমনকি কথা আছে! অবশ্য চ্যাপলিনের এই উক্তি থেকে বলা কঠিন, ছবির গল্পাংশ সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ প্রতিক্রিয়া কী। তবে এইটুকুই আন্দাজ করা যেতে পারে যে হয়তো তিনি পরে তলিয়ে বিচার করতে গিয়ে দেখেছেন যে মারির জীবনের পরিণতিটা যথেষ্ট বাস্তব বা যুক্তিপূর্ণ নয়, হয়তো তার ওই আশ্রমিকার জীবনকে আঁকড়ে ধরাটা ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, হয়তো তা আত্ম-প্রবঞ্চনারই শামিল। তাই হয়তো এই মনগড়া moralistic পরিণতির পেছনে একটা মস্ত ফাঁকির কথা বুঝতে পেরে ঠাট্টার সুরে ওই ধরনের উক্তি করে নিজেকেই তিনি সমালোচনা করেছিলেন। এবং বাস্তবিকই, এই আত্ম-জিজ্ঞাসা ছিল বলেই, নিজেকে প্রতি পদক্ষেপে শুধরে নিতে পেরেছিলেন বলেই, পরবর্তী ছবিগুলোতে এই রকমের ছোটখাটো দুর্বলতা একেবারেই দেখা যায় না।

প্রায় দুই বছর পরে ১৯২৫ সালের আগস্ট মাসে, 'ইউনাইটেড আর্টিস্ট'–এর দ্বিতীয় ছবি THE GOLD RUSH নিউইয়র্কের স্ট্যান্ড

থিয়েটারে প্রথম প্রদর্শিত হয়। অনেকের মতে THE GOLD RUSH চ্যাপলিনের শিল্পী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। চ্যাপলিন নিজেও এক সময় এই সম্পর্কে বলেছেন, —

'This is the picture I want to be remembered by.'

এই মন্তব্যের পরে চ্যাপলিন একাধিক ছবি তৈরি করেছেন এবং সেইসব ছবি জনসাধারণের কাছ থেকে যথোচিত সম্মান পেয়েছে। সুতরাং THE GOLD RUSH সম্পর্কে তাঁর সেই পুরোনো উক্তি এখনো তিনি মেনে চলেন কি না জানা নেই। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে এযাবৎ পৃথিবীতে যত ছবি হয়েছে সেগুলোর মধ্যে যে-কটা ছবি শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে তাদেরই একটি হচ্ছে সেই যুগের THE GOLD RUSH, এবং পরে ১৯৪২ সালে সবাক যুগে শব্দ ও কমেন্টারি যোজনের ফলে ছবিটির বক্তব্য ও আর্ট এতটুকু ক্ষুণ্ন তো হলোই না, বরং তা বেড়ে গেল আরো অনেকখানি। এমনকি, আজকের সবাক ছবির যুগে যেখানে ভালোমন্দ সমস্ত রকম নির্বাক ছবির সাধারণ প্রদর্শন একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানেও এই শব্দ যোজনার দরুন THE GOLD RUSH-এর আবেদন জনসাধারণের কাছে তিলমাত্র কমে যাওয়া তো দূরের কথা—তা যেন উত্তরোত্তর বেড়েও চলেছে। শোনা যায় গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্স যখন নাৎসী জার্মানির কবলে তখন জাতীয়তাবাদী ফরাসি সিনেমা–প্রদর্শকের দল ফ্রান্সের সর্বত্র THE GOLD RUSH-এর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং ছবিটি পরোক্ষভাবে নাকি সেই সময়ের প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রেরণা জোগাতে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে উঠেছিল। বিদেশি শাসন ও শোষণে নিষ্পেষিত ফ্রান্সের জনসাধারণ সেই সময়ে ভবঘুরে চার্লিকে দেখেছিল সমস্ত মানবজাতির অপরাজেয় আত্মার প্রতীক হিসেবে।

ভবঘুরের যাত্রা আবার শুরু হল, সোনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল সে। সহজ সরল স্বাভাবিক মানুষের প্রতিনিধি খুদে ভবঘুরে ছুটল রামধনুর দেশে, আলোর আশায়, চালু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায়। সাধারণ মানুষের জীবনের সীমাহীন লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতাকে

খুদে ভবঘুরেটির সমস্ত বৈশিষ্ট্য দিয়ে চ্যাপলিন ফুটিয়ে তুললেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে। পৃথিবীর সুধীসমাজে চ্যাপলিন গভীর আলোচনার বস্তু হয়ে উঠলেন।

একাদিক্রমে নয় বছর চ্যাপলিনের পঁয়ত্রিশখানা ছবিতে অভিনয় করার পরে THE GOLD RUSH-এ এডনাকে প্রথম অনুপস্থিত হতে দেখা গেল ! প্রধান স্ত্রীচরিত্রে প্রথমে ঠিক হলো নামানো হবে লিতা গ্রে-কে, যাঁকে চ্যাপলিন বিয়ে করেন পরিচয়ের কিছু পরেই, ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে। যাই হোক, লিতা গ্রে-কে শেষ পর্যন্ত বাতিল করে দিয়ে THE GOLD RUSH এর প্রধান স্ত্রীভূমিকায় মনোনীত করা হলো জর্জিয়া হেল নামে এক অভিনেত্রীকে। এঁকে চ্যাপলিন প্রথম দেখেছিলেন যোশেফ ফন স্টার্নবাগের THE SALAVATION HUNTER নামে ছবিতে। THE GOLD RUSH এর আর একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী হচ্ছেন ম্যাক নোয়্যান। চ্যাপলিন আগে থেকেই বলেছিলেন, এই ছবির পরে ম্যাক নোয়্যানের নাগাল পাওয়া রীতিমতো মুশকিল হয়ে উঠবে। ব্যস্তবিক হলোও তাই। চ্যাপলিনের এই ছবিটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক নোয়্যানের নাম ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে এবং এর পর থেকে তাঁর বাজারদরও অনেকখানি চড়ে গেল।

বরফের দেশ–দুর্গম পথ। কত লোক চলেছে এগিয়ে সেই পথ মাড়িয়ে সোনার খনির খোঁজে। চার্লিও চলেছে সেই পথে—মিছিলের সঙ্গে নয়—একা : A Lone Prospector. পরনে তাঁর সেই কোট আর ট্রাউজার, পায়ে সেই বিটকেল জুতো, মাথায় সেই টুপি আর হাতে তেমনি ছড়ি। কত আশা, কত উদ্দীপনা নিয়ে এক বিরাট লম্বা পথ অতিক্রম করে চার্লি এসে দাঁড়াল ছবির শুরুতে বরফের রাজ্যে। পেছনে হেলেদুলে আসছিল, এক মস্ত শ্বেত ভালুক। হাতের ম্যাপটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে, নিশানা ঠিক করে চার্লি চলল টুক্ টুক্ করে এগিয়ে।

হঠাৎ ঝড় এল। চার্লি কাছেপিঠে একটি ডেরায় আশ্রয় নিল। ডেরাটির মালিক এক মস্ত গোঁয়ার। চার্লিকে গোঁয়ার লার্সেন বের করে দিল দরজার বাইরে, কিন্তু প্রচণ্ড হাওয়া ওকে সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে নিয়ে এল

ভেতরে। এমনি করে হাওয়া আর গোঁয়ারটার সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল, তারপর এলো আরের উৎপাত। কোত্থেকে তাঁবুসমেত ঝড়ে উড়ে এল এক মানুষ—জিম ম্যাককে। তাঁবুটি সোজা লার্সেনের ডেরার দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে তিনটি মানুষ—চার্লি, লার্সেন ও ম্যাককে। আর বাইরে ও ভেতরে প্রচণ্ড ঝড়। চলল ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি। শেষ পর্যন্ত তিনজনেরই দম যখন একেবারে ফুরিয়ে এল, রুখে ওঠার এতটুকু শক্তিও যখন এদের রইল না, তখন আপনা থেকেই সমস্ত বিবাদের মীমাংসা হয়ে গেল।

খিদের জ্বালায় তিনজনেরই প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম হলো। লার্সেন বেরিয়ে পড়ল খাবারের সন্ধানে, কিন্তু পথ রুখে দাঁড়াল দুজন অশ্বারোহী পুলিশ! অতীত জীবনের কোনো বে-আইনি অপরাধের দরুন পুলিশ এই লোকটিকে এত দিন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু গোঁয়ারটার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না পুলিশ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল লার্সেন।

ওদিকে অনন্যোপায় হয়ে খিদের জ্বালায় চার্লি তার পায়ের একপাটি জুতো ভালোমতো সেদ্ধ করে খেতে বসে গেল। জিমকেও খানিকটা দেওয়া হলো। চার্লির ভাবখানা এমন যেন কোনো কেতাদুরস্ত হোটেলে বসে রীতিমতো জমকালো খানা খাচ্ছে সে। জুতোর ফিতে, চামড়া, শুকতলা, পেরেক প্রতিটিই যেন বাদশাহী খানার এক একটি পদ। জিমকে অবশ্য এই সমস্ত গলাধঃকরণ করতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হলো। এই চার্লি যখন দ্বিতীয়বার বাকি জুতোটাকেও রান্নায় চাপাবে এই রকম প্রস্তাব করল, তখন জিম ভড়কে গিয়ে একটা হইচই বাধিয়ে দিল। অথচ খিদের জ্বালাও অসহ্য। জিমের চোখের সামনে সবকিছুই কেমন বদলে গেল—চার্লি আর মানুষ নেই, সে যেন পুরোদস্তুর একটা মোরগ বনে গেছে। মোরগরূপী চার্লি আর বুভুক্ষু জিমের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি চলল খানিকক্ষণ। একটু পরেই অবশ্য জিমের ভুল ভেঙে গেল। কিন্তু যেই উনুন ধরাতে চার্লি বেশ খানিকটা ঝুঁকে বসেছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে জিমের চোখে চার্লি আবার মোরগ হয়ে দাঁড়াল। জিম তাকে

খাবে। খাবেই। আবার চলল ছোটাছুটি। জিম বন্দুক তাক্ করল 'মোরগ'টাকে মারবে বলে। ভয়ে 'মোরগ' তার পাখা দুটো ছড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জিমের ভুল দ্বিতীয়বারের মতো ভেঙে গেল, দেখা গেল চার্লি দুই হাত তুলে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিমের মুখোমুখি। জিমের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে চার্লি যখন বরফের মধ্যে সেটাকে লুকিয়ে রাখছে, তখন তৃতীয়বারের মতো জিমের মতিভ্রম হলো এবং শেষ পর্যন্ত তার ভুল যখন পুরোপুরি ভাঙল তখন চার্লি রীতিমতো হাঁপাতে শুরু করেছে।

এরপর এমন আরো কিছু কিছু ঘটনা ঘটল, তারপর দুজন দুদিকে রওনা হলো। পথে লার্সেনের সঙ্গে জিমের দেখা হতেই দুজনের মধ্যে আবার লড়াই শুরু হলো। লার্সেন জিমের মাথায় দু-ঘা কষিয়ে দিয়ে পালাল, কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই বরফের এক ঢিপি ধসে পড়ল লার্সেনের ওপর।

সোনার খনির কোনো হদিস না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চার্লি এসে পৌঁছাল পার্শ্ববর্তী এক শহরে। শহরের নাচঘরের মক্ষিরানীর ওপর সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি। মেয়েটির চটুল চাউনি একবার এসে পড়ল চার্লির উপর। একটু মুচকি হাসল সে। সঙ্গে সঙ্গে বেচারা চার্লির ভেতরটা কেমন যেন দুলে উঠল। পরমুহূর্তেই অবশ্য একটু ঘুরে দাঁড়াতেই চার্লির বুঝতে বাকি রইল না যে চাউনি বা হাসি কোনোটিই তার জন্য নয়। ভাগ্যবান পুরুষাটি তাঁরই পেছন দাঁড়িয়ে। কিন্তু নারী চিররহস্যময়ী। এক কামাতুর হ্যাংলাকে জব্দ করতে গিয়ে মেয়েটি হঠাৎ করে, খপ করে চার্লির হাত ধরে নাচতে শুরু করল। চার্লি নাচল, মনপ্রাণ ভরে উঠল মস্ত একটা তৃপ্তিতে। বিজয় গর্বে বিরাট ভারিক্কি চালে সে বেরিয়ে এল নাচঘর থেকে গটগট করে, যদিও তখন তার একপায়ে সেই জুতো—আর এক পায়ে জুতোর অভাবে শুধু ন্যাকড়া জড়ানো।

শহরে চার্লি কোনো রকমে থাকার মতো একটা জায়গার ব্যবস্থা করে নিল। সেখানে একদিন সে সাহস করে নাচঘরের সেই মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এল। সঙ্গে এল মেয়েটির তিনজন সঙ্গিনী। চার্লির ব্যবহারে

মেয়েরা তো হেসেই খুন। কিন্তু চার্লি ঘাবড়ে যাওয়ার মতো 'প্রেমিক' মোটেই নয়, মেয়েটির মন পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। এমনকি, নববর্ষ উপলক্ষে তাকে আলাদা করে নিমন্ত্রণ করে বসল চার্লি।

মেয়েটিকে খাওয়াতে হবে—পয়সা চাই। নানা ফিকির-ফন্দি করে চার্লি বেশ কিছু কামিয়ে ফিরে এল নিজের ডেরায়।

নববর্ষ! কাগজ কেটে চার্লি টেবিল ক্লথ তৈরি করল। টেবিলে খাবার সাজাল, আর সাধ্যমতো সাজাল ঘর। দরজায় শব্দ হতেই ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি মাথাটি শেষবারের মতো আঁচড়ে চার্লি দরজা খুলল মেয়েটিকে অভ্যর্থনা করতে। দরজার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা গাধা। তাড়ানোর আগেই গাধাটা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে কাগজের টেবিল ক্লথটিকে টেনে নিয়ে চিবোতে লাগল।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটির দেখা নেই। চার্লি অধীর প্রতীক্ষায় সময় গুনছে। খাবার সাজিয়ে টেবিলের সামনে চুপটি করে বসে আছে সে,—আকাশ-পাতাল ভাবছে। ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা এল চার্লির।...

নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে ঘরখানা গিজগিজ করছে। চারদিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে। মেয়েরা এসেছে চার্লির জন্যে নানা রকমের উপহার নিয়ে। নাচঘরের মেয়েটির চোখেমুখে যেন আজ কিসের দীপ্তি! মেয়েরা চার্লিকে কিছু বলতে বলল, কিন্তু বক্তৃতার বদলে চার্লি এক বিশেষ ধরনের নাচ দেখাল। দুটো রুটির দলা দুটো চামচে গেঁথে নিয়ে থালার ওপর নাচাতে শুরু করল। কাঁটাচামচের অপূর্ব নাচে নিমন্ত্রিতরা সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। নাচঘরের মেয়েটি নিজেকে আর চেপে রাখতে পারল না। দৌড়ে এসে আলিঙ্গন করল চার্লিকে। টাল সামলাতে না পেরে চার্লি মেঝেতে পড়ে গেল।....

দৃশ্য পরিবর্তন হলো। দেখা গেল, টেবিলের ওপর খাবার তেমনি সাজানো রয়েছে, আলো জ্বলছে, আর টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে বেচারা চার্লি। ওদিকে নাচঘরে তখন সত্যিই আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে।

নববর্ষের এই আনন্দোৎসবের মধ্যে কোথাকার কোন নাম-গোত্রহীন খুদে ভবঘুরের এই সামান্য নিমন্ত্রণের কথা মনে রাখা নাচঘরের মক্ষিরানীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু হঠাৎ যেন কেন তার মনে পড়ে গেল সেই কথা, সঙ্গে সঙ্গে খচ করে কী যেন বিঁধল তার বুকে। সেই রাতে মেয়েটি ক্ষমা চেয়ে চার্লিকে একখানা চিঠি লিখল। চিঠি পড়ে চার্লি আবেগের আতিশয্যে নেচে, লাফিয়ে, চেঁচিয়ে রীতিমতো একটা শোরগোল লাগিয়ে দিল।

'Man proposes but storm disproposes.' আবার এল দারুণ ঝড়। ডেরাসমেত চার্লি আর জিমকে (ঘটনাচক্রে জিম ইতিমধ্যে শহরে এসে চার্লির সঙ্গে বসবাস করছিল) উড়িয়ে নিয়ে গেল একেবারে বরফের দেশে। তারপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মস্ত বড়লোক হয়ে তারা যখন এল শহরে, তখন নাচঘরের মেয়েটিকে, আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

চার্লি আর জিম অগত্যা মনস্থ করল দেশে ফিরে যাবে এবং যথাযথ জাহাজে গিয়ে উঠল। সম্প্রতি বেশ কিছু সোনার মালিক হয়েও কিন্তু চার্লি তার পুরোনো স্বভাবটাকে তেমন মেরামত করে নিতে পারল না। বড়লোক মনে করে জাহাজের আর দশজন যাত্রী যখন চার্লি আর জিমকে খুব খাতির করছে, ঠিক সেই সময়েই ডেকের ওপর এক পোড়া সিগারেট দেখতে পেয়ে চার্লি হাত বাড়াল সেটাকে তুলে নিতে। অবশ্য জিমের ধমক খেয়ে নিজেকে সামলেও সে নিল চট করে।

দৈবক্রমে নাচঘরের সেই মেয়েটিও ওই জাহাজেই ছিল, কিন্তু চার্লি অথবা মেয়েটি কেউই কাউকে দেখতে পায়নি। অর্থকড়ি, খ্যাতি কিছুই আজ চার্লিকে আনন্দ দিতে পারছে না, মেয়েটির চিন্তা তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে সে পকেট থেকে সযত্নে রক্ষিত মেয়েটির ছেঁড়া ছবিটা তুলে নিয়ে প্রাণভরে একবার দেখল। কিন্তু কিছুই হওয়ার নয়।

শেষ পর্যন্ত যখন কেউই এতটুকু আশা করতে পারেনি ঠিক এমনি সময়ে এক বেয়াড়া পরিস্থিতির মধ্যে দুজন দুজনকে আবিষ্কার করল।

জনৈক সাংবাদিকের এক বেয়াড়া প্রশ্নের জবাবে অগ্র-পশ্চাৎ তেমন কিছু না ভেবেই চার্লি জানাল যে মেয়েটি তার ভাবী স্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে আচমকা এই দুঃসাহসিক উক্তির ধাক্কায় দুজনের মধ্যে এত দিনকার একটা অস্বস্তিকর ফারাক যেন সরে গেল—দুজন দুজনকে কাছে টেনে নিল।

১৯২৫ সালের আগস্ট মাসে যখন নিউইয়র্কে THE GOLD RUSH প্রথম দেখানো হলো এবং পরে যেখানেই ছবিটি মুক্তি পেল সেখানেই এক অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অসাধারণ সাফল্য ছাড়াও আলাদা করে সিনেমার ইতিহাসে যে জিনিসগুলো চিরকালীন হয়ে রইল—দর্শক মনে যা গেঁথে রইল নিবিড়ভাবে—তা হলো THE GOLD RUSH-এর কয়েকটি মন মাতানো দৃশ্য। এই দৃশ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বরফের দেশে চার্লির জুতো খাওয়া ও ক্ষুধার্ত জিমের মতিভ্রম হওয়ার ঘটনা এবং বিশেষ করে নববর্ষের নির্জন রাতে চার্লির ঘরে কাঁটা-চামচের আশ্চর্য সুন্দর নৃত্য। সব মিলিয়ে অপূর্ব রূপ-রসে সমৃদ্ধ হয়ে THE GOLD RUSH ভৌগোলিক সীমারেখা ডিঙিয়ে গোটা পৃথিবীর শিল্প-রসিকদের মাতিয়ে দিয়ে গেল অদ্ভুতভাবে। সিনেমার আর্ট উন্নীত হলো এক নতুন পর্যায়ে।

সিনেমার ইতিহাসের দিক থেকে এখানে একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, THE GOLD RUSH-এর সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৫ সালেই পৃথিবীর অপর প্রান্তে সিনেমার দর্শক আরেকখানা নির্বাক ছবি দেখতে পেল যা নিঃসন্দেহে সিনেমায় এক নতুন যুগের সূচনা করল। ছবিটি নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রের চিত্রপরিচালক সার্জি আইজেনস্টাইনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি—BATTILESHIP POTEMKIN.

চ্যাপলিনের সঙ্গে আইজেনস্টাইনের প্রথম দেখা হয় ১৯৩২ সালে। কয়েকটা ছবির কাজে আইজেনস্টাইনকে তখন আমেরিকায় যেতে হয়েছিল এবং প্রথম পরিচয়েই চ্যাপলিনের সঙ্গে সোভিয়েত দেশের এই তরুণ পরিচালকের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়।

আট

আর একবারের মতো এক ষোড়শীর প্রভাব প্রকট হয়ে উঠল চার্লি চ্যাপলিনের জীবনে! লিতা গ্রে নামে ষোলো বছরের যে মেয়েটি THE GOLD RUSH-এর প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের প্রথমে মনোনীত হলেন সেই মেয়েটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত চ্যাপলিনের একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠল। এর আগে চ্যাপলিনের দু-একটা ছবিতে অতি সামান্য ভূমিকায় মেয়েটিকে দেখা গিয়েছিল এবং তার কিছুদিন পরে যখন সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার মাইনেতে নায়িকার ভূমিকায় তাকে নিয়োগ করা হলো তখন আর কেউ না হোক—মেয়েটি আর তাঁর মা সত্যিই বড়ো অবাক হয়ে গেলেন। তার ওপর, বিভিন্ন কাগজপত্তরে নানা কায়দায় বিজ্ঞাপনের বহর দেখে মা-মেয়ের মাথাই গেল ঘুরে।

ব্যবসায়িক ও শিল্পীজীবনে ঘনিষ্ঠতার পরিণতি ঘটল এক মধুর পারিবারিক সম্পর্কে,... লিতা-চ্যাপলিন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন ১৯২৪ সালের ২৪ শে নভেম্বর। বিয়ের পরে যথারীতি কয়েকটা দিন কাটল দারুণ হইচইয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা ওই কয়েকটা দিন পর্যন্তই। কিছুদিন যেতে না যেতেই দুজনেই বুঝতে পারলেন তাঁদের মধুর সম্পর্ক আর বুঝি মধুর থাকছে না। প্রথম দিকটার ছোটখাটো বিবাদ, কথা-কাটাকাটি, মনকষাকষি চলতে লাগল এবং ক্রমেই তা যেন জটিল হয়ে উঠল। অশান্তি বেড়েই চলল দিনের পর দিন। একসঙ্গে থেকে, আলাদা থেকে, ঝগড়া করে বা দুটো মিষ্টি কথা বলে কিছুতেই কিছু হলো না। কোনো রকমে টেনেহিঁচড়ে সম্পর্কটাকে চালু রাখা হলো দু-তিনটে বছর এবং সেই সময়ের মধ্যে দুটি ছেলেও হলো। চ্যাপলিনের জটিল সম্পর্কটা আরো জটিল, আরো বিশ্রী হয়ে উঠল লিতার মায়ের মধ্যস্থতায়। মামলা-মোকদ্দমা, কাদা-ছোড়াছুড়ি চলল বেশ কিছুদিন, টিপ্পনি কাটা কাগজওয়ালাদের দল আর একবারের মতো উঠেপড়ে লাগলেন, সত্যি মিথ্যে নানা খবর পরিবেশন করে বাজার সরগরম করে তুললেন। এমনকি, এই সুযোগ নিয়ে আমেরিকার রক্ষণশীল দল নানাভাবে চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে লেগে গেলেন।

নানাভাবে তারা চ্যাপলিনকে হেয়প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেন। কাগজপত্তরে লেখালেখি করে, সভা-সমিতি করে, ভাড়াটে লোক লাগিয়ে তারা জনসাধারণকে এই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে চ্যাপলিন অমানুষ, মেয়েদের ভালোবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তাঁর জুড়িদার পাওয়া ভার, তিনি দুর্নীতিপরায়ণ, আমেরিকার সমাজ-জীবনের শক্ত বুনিয়াদে ঘুণ ধরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত। অতএব এই অবস্থায় এই ষড়যন্ত্রকারীর অসামান্য শিল্প-সৃষ্টিগুলোকে চিরকালের মতো বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই খুঁজে পেলেন না। 'জনস্বার্থকামী' রক্ষণশীলের দল তাই দাবি জানালেন, আইন চাপিয়ে চ্যাপলিনের ছবি অনতিবিলম্বে নিষিদ্ধ করা হোক।

বলা বাহুল্য, নীতিবাগীশদের এই নোংরা প্রচার আমেরিকার জনসাধারণের ওপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। উপরন্তু নানা মহল থেকে প্রতিবাদ এল, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিগুলোর ওপর বিশেষ একটি দলের এই অহেতুক জুলুমের বিরুদ্ধে অনেকেই রুখে দাঁড়ালেন। এমনকি, সুদূর ফ্রান্স থেকেও নামজাদা বুদ্ধিজীবীর দল এক যুক্ত বিবৃতি মারফত অত্যন্ত তীব্র ভাষায় রক্ষণশীল দলের এই চক্রান্তের নিন্দা করলেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন কবি লুই আরাগঁ, চিত্রপরিচালক রেনে ক্লেয়ার এবং আরো অনেকে।

যাই হোক, অনেক হট্টগোল, অনেক নোংরামি, অনেক অশান্তির পরে ১৯২৭ সালের ২২ আগস্ট দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাপলিনের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

লিতা-চ্যাপলিন হট্টগোলের মধ্যেই চ্যাপলিন তার পরবর্তী ছবি THE CIRCUS-এ হাত দেন। পারিবারিক জীবনে অশান্তির দরুন সাত রিলের এই ছবিটি শেষ করতে চ্যাপলিন সময় নিলেন অনেক বেশি, এবং অন্যান্য ছবিতে যতখানি নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি কাজ করতে পেরেছিলেন স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হলো না। অচঞ্চল নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করার মতো মন সেই সময় তাঁর ছিল না। তাই আর্থিক সাফল্য সত্ত্বেও THE CIRCUS ছবিটি প্রভাব দর্শক মনে

দীর্ঘস্থায়ী হলো না। চ্যাপলিনের সেরা ছবিগুলোর কাছাকাছি ঘেঁষতে না পেরেও এ-হেন আর্থিক সাফল্যের মূল কারণ প্রধানতঃ চ্যাপলিনের নামডাক, THE GOLD RUSH-এর অভূতপূর্ব সাফল্য।

ভবঘুরে চার্লি রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা করল এক সার্কাসের দলে। তাকে সেখানে লোক হাসাতে হবে। দর্শকের সামনে হাস্যকর জীব হতে সে কিছুতেই রাজি নয়, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের মতো চলতে গিয়ে সে যেন আরো হাস্যকর হয়ে উঠল। স্বাভাবিকতা তার ঠিক স্বভাবজাত নয় যেন। একটি মেয়ের সঙ্গে তার ভাব জমল। সার্কাসের মালিক এই মেয়েটির উপপিতা। মেয়েটির প্রতি মালিকের দুর্ব্যবহারের শেষ নেই। চার্লিরও তিনকুলে কেউ নেই। তাই অতি সহজেই দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হলো। এমনি সময়ে সার্কাস দলে এল আর একটি লোক। লোকটি এক মস্ত ওস্তাদ, তারের ওপর দিয়ে হাঁটে অদ্ভুতভাবে। দেখা গেল মেয়েটি যেন ক্রমেই ওই লোকটির দিকে ঝুঁকছে। চার্লি রাগে-দুঃখে ফেটে পড়ল। ইচ্ছে হলো যেন একটা ঘুসিতে লোকটার নাক থেঁতলে দেয়। দিনরাত খেটেখুটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চার্লিও তারের ওপর দিয়ে হাঁটার কৌশল আয়ত্ত করল, এবং একদিন সর্বসমক্ষে তারের খেলা দেখাতে গিয়ে এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেও ছাড়ল না। এরই মধ্যে একদিন চার্লিকে কিন্তু এক মস্ত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হঠাৎ কেমন করে এক ঘুমন্ত সিংহের খাঁচার মধ্যে আটকে পড়েছিল সে। কিছুতেই কিছু হয় না, বাইরের কুকুরটাও দৃশ্যটা দেখে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে এবং ব্যাপারটা দেখে মেয়েটি খাঁচার দরজা খুলে চার্লিকে উদ্ধার করার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে। এই অবস্থায় হঠাৎ যখন পশুরাজ আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল, তখন চার্লি ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। বুঝি আর রক্ষে নেই। ভারিক্কি চালে সিংহ এসে দাঁড়াল বেচারা চার্লির সামনে, সমস্ত শরীরটা শুঁকে দেখল। পশুরাজ বুঝল লোকটা একেবারে অখাদ্য, ঘেন্নায় দূরে সরে গেল। এমনি করেই সে-যাত্রায় চার্লি রক্ষা পেল। এর কিছু পরেই সার্কাস থেকে বিতাড়িত হয়ে অসহায় মেয়েটি যখন রাস্তায়

এসে দাঁড়াল বেকার চার্লির পাশে, (চার্লি ইতিমধ্যে বেকার হয়ে পড়েছে) তখন চার্লি এতটুকু ইতস্তত না করে মেয়েটিকে নিয়ে সোজা চলে এল সার্কাসে এবং তাদের ওস্তাদ খেলোয়াড়টির হাতে মেয়েটিকে সমর্পণ করল। ওস্তাদের চোখ-রাঙানির সামনে মালিক একেবারে কেঁচো হয়ে রইল—মেয়েটির অর্থাৎ ওস্তাদের সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীকে কিছু বলা তো দূরের কথা, চার্লিকেও শেষ পর্যন্ত সার্কাসে ঢুকিয়ে নিতে বাধ্য হলো। সবশেষে সার্কাসের দল যখন তলপি-তলপা গুটিয়ে স্থানান্তরে যাওয়ার তোড়জোড় করছে, তখন নবদম্পতি চার্লিকে তাদের গাড়িতে উঠে আসতে অনুরোধ করল। চার্লি জানাল যে দুজনেই জমবে ভালো। বলেই সে গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিল। গাড়ি চলে গেল, সার্কাসের দল ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলো—ভবঘুরে আবার একা। ভবঘুরে আবার চলল এগিয়ে টুকটুক করে। সামনে পড়ে রয়েছে অন্তহীন রাস্তা।

বিষয়বস্তু ছাড়াও আঙ্গিকের দিক থেকে চ্যাপলিন THE CIRCUS ছবিতে বিশেষ কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারলেন না। অবশ্য শ্ল্যাপস্টিকের আবরণে Chaplinesque অ্যাকশন ছবির আগাগোড়াই ছড়িয়ে রইল, এবং অন্যান্য ছবির তুলনায় এখানে শ্ল্যাপস্টিকের মাত্রা খানিকটা বেশি পরিমাণেই লক্ষ করা গেল। হাসার মতো উপকরণ ছবিতে যথেষ্টই ছিল, সূক্ষ্ম রসবোধের খামতিও তেমন একটা দেখা গেল না। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে ছবিটিতে এমন কিছু পাওয়া গেল না, যে-কারণে THE CIRCUS চ্যাপলিনের সেরা ছবির আসরে সম্মানিতের স্থান পেতে পারে।

*　　*　　*

সিনেমাশিল্পে বিরাট বিপ্লব ঘটিয়ে ছবিতে ভাষা এল ১৯২৮ সালে। প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেল সমস্ত পৃথিবীতে। সিনেমার কলাকুশলীরা হাতে স্বর্গ পেলেন, অনেকে নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন সিনেমার ফর্মকে—দর্শক মুখিয়ে রইলেন নতুন কিছু দেখার আশায়। কিন্তু দেখা গেল গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে চ্যাপলিন সিনেমায় এই নতুন বিস্ময়কর

আবিষ্কারকে দূরে সরিয়ে রাখলেন—ভাষাকে তিনি গ্রহণ করলেন না। তাঁর মতে ভাষা সিনেমার মূক-অভিনয়কে তথা সিনেমার মৌলিকতাকে ক্ষুণ্ন করবে। তিনি আশঙ্কা করলেন, ভাষার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে তাঁর সৃষ্ট খুদে ভবঘুরেটির সর্বজনীন চরিত্র অবশ্যই অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাই সেই বছর THE CIRCUS ছবিটির মুক্তির পর CITY LIGHTS-এর কাজে হাত দিতে গিয়ে ছবিতে তিনি শব্দ-প্রয়োগ করবেন না বলেই ঠিক করলেন। পরে অবশ্য আবহ-সঙ্গীত ও কিছু কিছু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক শব্দ ছবিটিতে জুড়তে হয়েছিল তাঁকে, যদিও মূলত ছবিটি নির্বাকই রইল। অর্থাৎ কোনো চরিত্রই কোনো কথা বলল না। বরাবরের ধরনে শুধু মূক-অভিনয়ে অর্থাৎ প্যান্টোমাইম চলল। অথচ আশ্চর্য চ্যাপলিনের বিস্ময়কর প্রতিভার ফলে শব্দ সৃষ্টির এই নতুন চাঞ্চল্যকর হাতিয়ারের সমৃদ্ধ না হয়েও CITY LIGHTS ছবিটি চ্যাপলিনের এক সেরা ছবি বলে পরিগণিত হলো, বাস্তব জীবনবোধের নিপুণ শিল্পায়নের ফলে হাসির আবরণে সাধারণ মানুষের বেদনা-লাঞ্ছিত জীবন ফুটে উঠল সহজ সরল সুন্দর করে।

ইউনাইটেড আর্টিস্টর্স-এর হয়ে চ্যাপলিনের চতুর্থ ছবি CITY LIGHTS. অবশ্য এই ছবিতে হাত দেওয়ার আগে অনেকের ধারণা ছিল চ্যাপলিন হয়তো এবার নতুন ধরনের কোনো ছবির কথা ভাবছেন। চ্যাপলিনের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে কিছু কিছু কথা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ার দরুন অনেকে ওই ধরনের ধারণা করেছিলেন। এবং বাস্তবিকই কিছুদিন ধরে চ্যাপলিন সত্যি সত্যিই ভাবছিলেন নেপোলিয়ন এবং যিশুখ্রিষ্টকে নিয়ে ছবি করা সম্ভব কি না। নেপোলিয়নের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক উৎকর্ষ মহীয়ান মানুষ-যিশুখ্রিষ্ট চ্যাপলিনের শিল্প-মানসে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেই তিনি ওই রকমের কিছু করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত ওই সমস্ত চিন্তা ফলপ্রসূ হলো না, হল এক ফুলওয়ালীকে কেন্দ্র করে একটি ছিমছাম ছবি–CITY LIGHTS.

অন্ধ ফুলওয়ালীর চরিত্রটি কাকে দেওয়া হবে এই নিয়ে চ্যাপলিনের

ভাবনার অন্ত নেই। দিনের পর দিন স্টুডিওতে মেয়েদের আনাগোনা চলল। কিন্তু কাউকেই চ্যাপলিনের মনে ধরছে না। এমনি সময়ে একদিন এক বক্সিং খেলায় দর্শকের মধ্যে একটি অচেনা মেয়ে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরের দিন মেয়েটিকে খুঁজে বের করা হলো, এবং সপ্তাহে একশ ডলার মাইনেতে তাঁকে নিয়োগ করা হলো CITY LIGHTS-এর প্রধান অভিনেত্রীর ভূমিকায়। এই নতুন অভিনেত্রীটির নাম ভার্জিনিয়া চেরিল। অভিনয়ের কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই, তবু নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই সামান্য পরীক্ষা করেই চ্যাপলিন তাঁকে মনোনীত করলেন।

ভার্জিনিয়া চেরিলকে নিয়ে শুটিং চালু হলো। ছবি প্রায় অর্ধেকটা এগিয়ে গেল। ধীরে ধীরে ভার্জিনিয়ার মধ্যে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। অভিনয়টাকে যেন তিনি আর যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছেন না, দায়িত্বটাকে কোনো রকমে ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই যেন তিনি বেঁচে যান। আসলে অভিনয়ের প্রতি নিষ্ঠা মহিলাটির কোনোদিন ছিল না, চ্যাপলিনের কথাবার্তায় সাময়িকভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন মাত্র। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত উৎসাহ গেল উড়ে, রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি। প্রথমে অল্পসল্প এবং পরে নিয়মিতভাবে ভার্জিনিয়া শহরের নৈশ আসরগুলোতে হানা দিতে লাগলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবির কাজে ফাঁকির মাত্রাটা যেন ক্রমেই বাড়তে লাগল। ছবির প্রতি এ-হেন অশ্রদ্ধায় চ্যাপলিন ক্ষেপে গেলেন এবং অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই একদিন ভার্জিনিয়া চেরিলকে ছবির কাজ থেকে অব্যাহতি দিলেন। অর্থাৎ নতুন করে নতুন অভিনেত্রী নিয়ে চ্যাপলিনকে আবার শুরু থেকে এগোতে হবে। চ্যাপলিনের এই 'খামখেয়ালি' সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মনঃপূত হলো না। কিন্তু তাঁর মুখের ওপর কিছু বলবে এমন সাহসও কারো নেই। তালে তাল দেওয়া ছাড়া কর্মীদের কোনো গত্যন্তর নেই। কিছুদিন কাটল নতুন মেয়ের সন্ধানে। শেষ পর্যন্ত নানা কিছু ভেবে, একাধিক মেয়ে দেখাশোনা করে চ্যাপলিন আবার ফিরে এলেন ভার্জিনিয়ার কাছে। ভার্জিনিয়াকে চ্যাপলিন

বোঝালেন, গালমন্দ করলেন এবং তাঁকে দিয়েই ছবির বাকিটুকু করিয়ে নিলেন সুষ্ঠুভাবে।

CITY LIGHTS ছবিটির প্রথম প্রদর্শন হলো ১৯৩১ সালে, আগেকার ছবিটি দেখানোর তিন বছর পরে। ১৯৩১ সালের সবাক যুগে শুধুমাত্র আবহ-সংগীত ও সামান্য কিছু শব্দপ্রয়োগ ছাড়া আগাগোড়াই একটা নির্বাক ছবির এক স্বপ্নাতীত আর্থিক সাফল্য নিঃসন্দেহে চ্যাপলিনের বিরাট কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। বিশেষ করে ছবির আবহ-সঙ্গীত চ্যাপলিন যখন নিজেই রচনা করলেন তখন দর্শকের আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। একাধারে কাহিনীকার, পরিচালক অভিনেতা ও সঙ্গীত পরিচালক হওয়া সিনেমার ইতিহাসে ঘটল এই প্রথম।

গল্পের দিক থেকে যেমন, ঠিক তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও দেখা গেল এতটুকু জটিলতা নেই CITY LIGHTS ছবিটিতে। ছিমছাম, তক্‌তকে-ঝকঝকে একখানা ছবি, মানবিক আবেদন ভরপুর। আলাদা করে হয়তো এমন কোনো দৃশ্যের বা ঘটনার উল্লেখ করা গেল না যা সিনেমার আর্টে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সমস্তটা মিলিয়ে এমন এক বেদনা-বোধের হদিস এখানে মিলল, এমন একটা আবেগের সঞ্চার করল ছবিটি যা শুধু সে যুগের কেন আজকের দিনের দর্শকদেরও মনকে নাড়া দেবে প্রচণ্ডভাবে।

মস্ত এক শহর, চারদিকে ব্যস্ততার সীমা নেই। এমনি এক ব্যস্তবাগীশ শহরে একদিন ভোরে দেখা গেল গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে ভিড় করেছেন এক পার্কে, এক স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন করা হবে। To the people of the city we donate this monument; peace and prosperity'. বিরাট এক নারীমূর্তি, দুই পাশে দুজন পাহারাদার। কর্তাব্যক্তিদের একজন নানা ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে আচ্ছাদনাট খুলে ফেলতেই দেখতে পেলেন বেঁটে খাটো এক ভবঘুরে নারীমূর্তিটির কোলের ওপর কুকুর কুণ্ডলি হয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে। রাগে ফেটে পড়লেন কর্তারা। কী জঘন্য সব ব্যাপার! কী অপমান! সভ্য সমাজে এমনও ঘটতে পারে! সবাই একেবারে মারমুখী হয়ে উঠলেন।

লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার তাঁরা শুরু করলেন তাঁদের কাজ।

টুকটুক করে হেঁটে চলেছে চার্লি।—কোনো ঠিকানা নেই, উদ্দেশ্য নেই কোনো– চলেছে তো চলেছেই। রাস্তার এক অন্ধ ফুলওয়ালীর সঙ্গে চার্লির পরিচয় হলো। শহরের এক লাখপতির গাড়ির আওয়াজ শুনে ফুলওয়ালীটি ছুটে এসেছিল ফুল বেচতে। চার্লি তখন ঠিক সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিল। ভুল করে মেয়েটি চার্লির সামনে এসে দাঁড়াল ফুলের ডালা হাতে, চার্লিকেই সে লাখপতি মনে করে বসল। শেষ কপর্দকটি চার্লি মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে তার দেওয়া ফুলটি আলতোভাবে তুলে নিল, মেয়েটির অজান্তে বসে রইল তার পাশে, গভীর মমত্ববোধে উপছে উঠল তার মনপ্রাণ। তারপর, রাত বাড়তেই মেয়েটি ফিরে গেল তার ডেরায়—তার দিদিমার কাছে, আর চার্লি চলল তার অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে।

গভীর রাত। এক লাখপতি প্রচণ্ড মাতলামির ঝোঁকে আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করল। কোমরের সঙ্গে একটা ভারী পাথর বেঁধে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় চার্লি এসে উপস্থিত। নানাভাবে চার্লি তাকে বোঝাল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়। আত্মহত্যা সে করবেই। কত প্রলোভন দেখাল চার্লি—জীবনের প্রলোভন 'Tomorrow the birds will sing, Be have, face life.' কিন্তু ভালো কথায় কান দেওয়ার মতো মানসিক স্বাস্থ্য তখন আর তার নেই। উপরন্তু, তার কোমরের দড়ির একটা অংশ চার্লির গলায় জড়িয়ে সে লাফিয়ে পড়ল নদীতে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বেঁচে উঠল দুজনেই, নদীর মধ্যে দু-চারবার খাবি খাওয়ার পরই দেখা গেল, মরতে কিন্তু লাখপতিও সত্যি চায়নি।

এর পর থেকে লাখপতির সঙ্গে চার্লির মজার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। রাতে প্রমত্ত অবস্থায় সে চার্লির ইয়ার, গলায় গলায় বন্ধুত্ব, কিন্তু দিনের বেলায় নেশা কেটে যেতেই সে বনে যেত পুরোদস্তর লাখপতি, চিনতেই পারে না নাম গোত্রহীন ভবঘুরেকে। বলা বাহুল্য, প্রমত্ত অবস্থার বন্ধুত্বটুকুকে চার্লি কাজে লাগাতে ছাড়ল না বন্ধুর গাড়ি করে অন্ধ ফুলওয়ালীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, বন্ধুর দেওয়া টাকায় মেয়েটির সমস্ত

ফুল কিনে নেওয়া—এই সমস্ত চলল সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েটির চোখে চার্লি লাখপতি হয়েই রইল, শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠল। চার্লির ভেতরটাও যেন ভালোবাসার দীপ্তিতে ঝলসে উঠল।

একদিন চার্লি যথাস্থানে এসে দেখে মেয়েটি নেই সেখানে। কালবিলম্ব না করে সে দৌড়ে গেল মেয়েটির আস্তানায়। গিয়ে সে দেখল, মেয়েটি অসুস্থ। চিকিৎসার প্রয়োজন, প্রয়োজন অর্থের। তা ছাড়া বিপদের ওপর বিপদ। ঘরভাড়া ঠিকমতো দিতে পারেনি বলে বাড়িওয়ালা শাসিয়ে গেছে, দু-একদিনের মধ্যেই তাদের উঠে যেতে হবে।

তারপর খবরের কাগজে এক বিজ্ঞাপনে চার্লি দেখল ভিয়েনায় কোনো এক ডাক্তার নাকি কি রকম এক অস্ত্রোপচার করে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারেন। মেয়েটিকে কথা জানাতেই সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল, তাহলে সে তার প্রেমাস্পদকে দেখতে পাবে! চার্লি প্রমাদ গুনল। তাঁকে দেখলে মেয়েটি না জানি কী ভাবে। যাই হোক, অর্থের প্রয়োজন। এক-আধটা নয়, অনেক। মরিয়া হয়ে অর্থের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল খুদে ভবঘুরে। কিন্তু কোথায় পাবে সেই অর্থ? তার একমাত্র লাখপতি বন্ধুটি তখন ইউরোপ সফরে বেরিয়েছে। কিন্তু তবু সে চুপ করে বসে রইল না, এটাওটা করল, এমনকি বক্সিং প্রতিযোগিতায় জাঁদরেল লড়িয়েদের সঙ্গে লড়ল পর্যন্ত,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এমনি সময়ে হঠাৎ লাখপতি বন্ধুটি ফিরে এল দেশে। প্রমত্ত অবস্থায় চার্লির সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতেই তাকে চিনতে দেরি হলো না, বাড়ি নিয়ে গেল তাকে। চার্লি সুযোগ বুঝে তার প্রয়োজনের কথা লাখপতিকে জানাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের অর্থ পেয়েও গেল সে। ঠিক সময় বাড়িতে ডাকাত পড়ল, চলল দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি। পুলিশের খপ্পরে শেষ পর্যন্ত পড়ল চার্লি নিজেই। শনাক্ত করার জন্যে তাকে হাজির করা হলো লাখপতির কাছে, তখন তার নেশা কেটে গেছে।

চার্লি বুঝল, অবস্থা কাহিল। অথচ কিছু না করলেই নয়। নানা ফিকিরফন্দি করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এল সে। সোজা

চলে এল অন্ধ ফুলওয়ালীর আস্তানায় এবং সমস্ত অর্থ ফুলওয়ালীর হাতে গুঁজে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। পুলিশের খপ্পরে শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকে পড়তেই হলো, কিন্তু মস্ত একটা তৃপ্তি নিয়ে সে যেতে পারল।

কয়েক মাস গত হলো, চার্লি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে! খুদে ভরঘুরে এসে দাঁড়াল রাস্তার সেই কোণে, কিন্তু ফুলওয়ালীর দেখা পাওয়া গেল না। পাশের এক ডাস্টবিন থেকে একটা ফুল সে তুলে নিল, মনে পড়ল সেই পুরোনো দিনের কথা।

রাস্তায় ছেলেরা চার্লিকে পাগল ভেবে হইচই শুরু করে দিল, রীতিমতো অতিষ্ঠ করে তুলল তাকে। গোলমাল শুনে রাস্তার পাশে মস্ত এক ফুলের দোকানের কর্ত্রী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল কি ঘটছে রাস্তায়। চার্লির হঠাৎ নজর পড়ল সেই দিকে, একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। ফুলের দোকানের কর্ত্রীটি আর কেউ নয়, সেই অন্ধ ফুলওয়ালী। চার্লি যখন জেলে দিন গুনছে তখন সে চার্লির অর্থ দিয়ে তারই কথা মতো অস্ত্রোপচার করিয়ে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। প্রচুর খুঁজেছে সে তার প্রেমাস্পদকে, কিন্তু কোনো হদিস সে পায়নি। আজ হঠাৎ এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে দুজনের দেখা হলো।

চার্লি মেয়েটিকে চিনতে পারল সত্যি, কিন্তু মেয়েটি তাকে চিনবে কেমন করে। সে তো সত্যিই লাখপতি নয়, মেয়েটির 'চোখে' সে আজ রাস্তার এক ভিখিরি। ফ্যাল ফ্যাল করে চার্লি তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি অর্থাৎ ফুলের দোকানের কর্ত্রী মনে করল বুঝি লোকটা কিছু সাহায্য চায়। একটা ফুল আর কিছু পয়সা নিয়ে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। চার্লি প্রথমে কাছে যেতে সাহস পেল না,—ভয়, লজ্জা, সংশয় তার পা-দুটোকে অসাড় করে দিল। তারপর নিজেকে খানিক সামলে নিয়ে মেয়েটির কাছে সে এগিয়ে গেল। নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে ফুলটি ও পয়সা কয়েকটি লোকটার হাতে গুঁজে দিতে গিয়েই মেয়েটি যেন কেমন হয়ে গেল। হাতে হাত লাগতেই সামান্য স্পর্শেই বুঝল লোকটা কে। মুখ দিয়ে ছোট একটা কথা বেরিয়ে এল তার, 'তুমি?' চার্লি বোকার

মতো হাসল একটু, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ।'

—'হ্যাঁ পাচ্ছি।'

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে তারা।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে CITY LIGHTS প্রথম প্রদর্শিত হলো নিউইয়র্কে। নানা কারণে এবার চ্যাপলিনের হাওয়া-বদলের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তিনি ঠিক করলেন ইউরোপ যাবেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। দু-তিনজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তিনি বেরোলেন দ্বিতীয়বারের ইউরোপ সফরে। পরে এক সময় তিনি তাঁর ইউরোপ-যাত্রার কারণ সম্পর্কে বলেছিলেন—

'The disillusion of love, fame and fortune left me somewhat apathetic. I needed emotional stimulus.....like all egocentrics I turn to myself. I want to live in my youth again.'

এবং বাস্তবিকই, এবারও কয়েক মাস ঘুরে চ্যাপলিন ফিরে এলেন এক নতুন মানুষ হয়ে, নতুন উদ্যমে নিজেকে নিয়োগ করলেন শিল্পকর্মে।

ইউরোপে এবারও চ্যাপলিন অভূতপূর্ব সমাদর পেলেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, সুধী-সমাজেও বিশেষ সমাদৃত হলেন। তিনি আইনষ্টাইন, বার্নার্ড শ, মহাত্মা গান্ধী, লয়েড জর্জ প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য, সমাজ-সমস্যা ইত্যাদি নানা জটিল বিষয়ে গভীর আলোচনায় ব্যাপৃত রইলেন। সর্বত্রই তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বলে স্বীকৃত হলেন।

ইউরোপে তখন দেখা দিয়েছে দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, তারই চাপে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। অর্থনৈতিক জীবনের এই চরম বিপর্যয় স্বভাবতই চ্যাপলিনকে ভাবিয়ে তুলল। বাস্তব যাচাই করে তাই তিনি প্রচার করলেন মুক্তির ফতোয়া—

Reduce the hours of labour, abolish gold standard,

print more money and control prices.

রাষ্ট্রীয় নেতাদের সঙ্গে তিনি এই সমস্ত নিয়ে বহু আলোচনা করলেন, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার কথাটাকে বারবার তিনি তাঁদের জানিয়ে দিলেন। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড-এর প্রতি চ্যাপলিন তেমন প্রসন্ন হলেন না এই কারণে যে নানাভাবে চেষ্টা করেও ভদ্রলোককে কিছুতেই তিনি রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে টেনে আনতে পারলেন না। অপরপক্ষে, লয়েড জর্জের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে চ্যাপলিনের আলোচনা হলো এবং খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ দিয়েছিলেন বলেই চ্যাপলিন ইংল্যান্ডের সেই সময়কার রাষ্ট্রীয় নেতাদের মধ্যে লয়েড জর্জকেই সবচেয়ে বেশি খাতির করলেন। জার্মানিতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেও তিনি এই সমস্ত নিয়ে গভীর আলোচনা করলেন। একজন সিনেমা-শিল্পীর মুখ থেকে এই সব কথা শুনে আইনস্টাইন অবাক হয়ে গেলেন। হেসে বললেন, 'কে বলে আপনি কমেডিয়ান? আপনি তো দেখছি এক পুরোদস্তুর অর্থনীতিবিদ।

বার্নার্ড শ'র সঙ্গে চ্যাপলিনের শিল্প সম্পর্কে কিছু তর্ক-বিতর্ক হলো, যদিও তর্কে চ্যাপলিন তেমন এঁটে উঠতে পারলেন না। বার্নার্ড শ' বললেন যে সমস্ত শিল্প প্রচারধর্মী হতে বাধ্য, কিন্তু প্রচারমাত্রই শিল্প নয়। চ্যাপলিন শ'র সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি জানালেন যে রসসৃষ্টি করাই শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য, এ ছাড়া শিল্পের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শিল্প সম্পর্কে বার্নার্ড শ'র এই চরম মতবাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে-ভাবে কথাটা বলা হয়, একটু তলিয়ে বিচার করলেই অবশ্য বোঝা যায় বাস্তবক্ষেত্রে চ্যাপলিন তা সম্পূর্ণ মেনে নেননি। শিল্পের ক্ষেত্রে রসসৃষ্টিই যে প্রধান এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—এই রস সৃষ্টির মূল উৎস কী? চ্যাপলিনের ছবিগুলো আগাগোড়া পর্যালোচনা করলেই পরিষ্কার দেখা যায় যে তিনি রসসৃষ্টির মূল উপাদান খুঁজে

পেয়েছেন সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, তাদের দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগের মধ্যে, তাদের জীবনের সীমাহীন বেদনার মধ্যে। এবং এই কথাটাই চ্যাপলিন বহুবার বলেছেন বহুভাবে। এমনকি দর্শক ও শিল্প প্রসঙ্গে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন যে বাস্তব সত্য দর্শকের একান্ত কাম্য, শিল্প-প্রচেষ্টায় তাই বাস্তবের প্রয়োগ অপরিহার্য। তাই তার্কিক আলোচনায় শিল্পের রাজ্যে রাজনীতিকে সোজাসুজি বে-আইনি করে দিলেও বাস্তবপক্ষে শিল্পী চ্যাপলিন রাজনীতিকে একেবারে নাকচ করে দিতে পারেনি। নাকচ করে দেওয়া তাঁর মতো জীবনধর্মী শিল্পীর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তার ওপর পরবর্তী জীবনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যতই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল, সাধারণ মানুষের জীবন ক্রমেই এক বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় হট্টগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছিল, দেখা গেল চ্যাপলিনের পক্ষে ততই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। তাই ১৯৪০ সালে The great dictator ছবিটির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মহল থেকে যখন চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে স্থূল প্রচারের অভিযোগ হাজির করা হলো তখন এতটুকু পিছিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা—সরাসরি তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে পৃথিবীর এই দুর্যোগের দিনে তাঁর তরফ থেকে বলার মতো কিছু অবশ্যই রয়েছে—এবং তা তাঁকে বলতেই হবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটাও চ্যাপলিন মুহূর্তের জন্যে ভোলেননি যে, তাঁর যা কিছু বক্তব্য তা তাঁকে প্রকৃত শিল্পসম্মত উপায়েই বলতে হবে। শিল্প হিসেবে এটাই যে তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন বলেই চ্যাপলিন আজ পৃথিবীর সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এত প্রিয়, এত কাছাকাছি।

চ্যাপলিনের এবারকার ইউরোপ সফরের সময়ে গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী লন্ডনে উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে চ্যাপলিন জানালেন। গান্ধী এর আগে চ্যাপলিনের নাম কখনো শোনেননি, শোনার কথাও নয়। কারণ ভারতবর্ষে চ্যাপলিনের ছবি সেই সময়েই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও গান্ধী সিনেমাকে সুস্থ সমাজ-জীবনের সহায়ক বলে একেবারেই মনে করতেন না! বরং

জনসাধারণের ওপর সিনেমার বিরাট প্রভাব বিস্তারকে তিনি দেখেছিলেন বর্তমান সভ্যতার একটা মস্ত অসুস্থ দিক হিসেবে। তাই লন্ডনে অবস্থানকালে যখন তাঁকে জানানো হলো যে সিনেমা শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা চার্লি চ্যাপলিন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক তখন তিনি প্রথমে রাজি হলেন না। পরে অবশ্য দেখা হলো।

নানা কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন গান্ধীর সঙ্গে চ্যাপলিনের সামান্যই কথা হলো। গান্ধীর পরনের সেই চিরাচরিত পোশাক—'অর্ধ উলঙ্গ ফকির'। কোমরে ঝোলানো এক বেখাপ্পা ঘড়ি। অল্প কথার মধ্যে চ্যাপলিন গান্ধীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, বর্তমান সভ্যতার মহার্ঘ্য অবদান হচ্ছে যন্ত্র। গান্ধী অবশ্য তা মেনে নিতে পারলেন না বললেন। 'যন্ত্র সম্পর্কে আপনার মত পাশ্চাত্য-জীবনে কাজে লাগতে পারে, কিন্তু প্রাচ্যে তা সম্ভব নয়।' কথাটা বলেই গান্ধী উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়িটা একবার দেখেই জানালেন যে তাঁকে এখুনি যেতে হবে—প্রার্থনার সময় হয়ে গেছে। গান্ধী চলে যেতেই চ্যাপলিন শুধু বললেন—'A tremendous personality' অবশ্য গান্ধীর এই 'সেকেলে' মত চ্যাপলিন কিন্তু কখনো মেনে নেননি।

এবারও চ্যাপলিন বস্তিতে বস্তিতে প্রচুর ঘুরলেন। কেনিংটন পার্কে গেলেন, ঘুরলেন ল্যাম্বেথ-এ, সরু সরু অন্ধকার অলিতে-গলিতে। ছেলেবেলায় চ্যাপলিন দু'বছরের জন্যে যে-স্কুলে পড়েছিলেন—যে স্কুলটি তখনো চলছিল বস্তির গরিব ছেলেদের নিয়েই এবং এত দিনেও যার সংস্কার এতটুকু হয়নি—সেখানেও গেলেন তিনি। ছোট ছোট গরিব ছাত্রদের সঙ্গে চ্যাপলিন যথেষ্ট অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বললেন, তাদের জন্য খেলনা—খাবার-বইপত্তর কিনে আনলেন। কেমন করে ছেলেদের এবং স্কুলের অবস্থার পরিবর্তন আনানো সম্ভব তাই নিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনাও করলেন অনেক।

কয়েক মাস ঘুরে চ্যাপলিন যখন সদলবলে আমেরিকায় ফিরলেন তখন পৃথিবীর মানুষ আবার উদগ্রীব হয়ে উঠল নতুন কোনো ছবি দেখার আশায়।

*　　*　　*

১৯৩৬ সাল। ইউনাইটেড আর্টিস্ট–এর হয়ে চ্যাপলিন চতুর্থ ছবি MODERN TIMES সাধারণ্যে মুক্তি পেল। চ্যাপলিন এবার তাঁর সৃষ্ট খুদে ভবঘুরেকে নিয়ে ফেললেন নতুন পরিবেশে—কারখানায়। শতকরা নব্বইজন যেখানে গরিব, সেই সমাজে মজুরের অস্বস্তিকর যান্ত্রিক জীবনের বিরুদ্ধে ভবঘুরের স্বাভাবিক ঘৃণা ও বিদ্রোহ এই ছবিতে রূপায়িত হলো। Chaplinesque বৈশিষ্ট্য নিয়ে খুদে ভবঘুরেটির পক্ষে এই পরিবেশে যা করা সম্ভব কাহিনীর পরিণতি ঘটল তারই ভেতরে। তাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে খতম করার কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে অথবা শিল্পের (industry) জাতীয়করণের কোনো আভাস না দিয়েই চ্যাপলিন তাঁর চরিত্রকে তুলে নিয়ে এলেন কারখানার বাইরে– রাজপথের বিস্তৃতির মাঝে। ফাঁকা রাস্তায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে খুদে ভবঘুরে তার সঙ্গিনীর হাত ধরে আবার চলল টুকটুক করে তার যাত্রাপথে।

MODERN TIMES—এর প্রধান নারী-চরিত্রে এবার চ্যাপলিন যাঁকে মনোনীত করলেন তাঁর নাম পলেট গডার্ড। এর আগে সিনেমাতে মহিলাটি খুবই সামান্য টুকরো টুকরো অভিনয় করতেন—মনে রাখবার মতো বা চিনবার মতো কেউ নন তিনি। কিন্তু এর মধ্যে, চ্যাপলিন দেখতে পেলেন এক মস্ত প্রতিভার সম্ভাবনা এবং চ্যাপলিনের শিক্ষার গুণে পলেট তাঁর যথার্থ পরিচয় অবশ্যই দিতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, শিল্প-সম্পর্ক ছাড়াও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চ্যাপলিনের সঙ্গে পলেটের এক পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার পরিণতি ঘটল বিবাহবন্ধনে। অবশ্য বন্ধনটি এবারও স্থায়ী হলো না, ১৯৪২ সালে তৃতীয়বারের মতো চ্যাপলিনের বিবাহবিচ্ছেদ হলো। এবার কিন্তু বিচ্ছেদের দরুন কাউকেই তেমন ঝামেলা পোহাতে হলো না।

MODERN TIMES-এর স্থান : কারখানা অঞ্চল, কাল : আধুনিক ও পাত্র : সেই খুদে ভবঘুরে। শুরুতেই দেখা গেল একদল ভেড়া—নিতান্তই নিরীহ, অভাগা। ভেড়ার দলটিকে ঠেঙিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মস্ত এক ফটকের ভেতরে। পরক্ষণেই দেখানো হলো, বিস্তর মজুর

ঢুকছে কারখানায়। তাদেরই সঙ্গে টুকটুক করে ঢুকছে ভবঘুরে চার্লি। অর্থাৎ চার্লি পুরোদস্তুর মজুর বনে গেছে।

কারখানায় চার্লির কাজের অন্ত নেই। চারপাশে যন্ত্রের গতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে। এতটুকু এদিক-ওদিক হতেই দারুণ বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে তাকে। গতিশীল যন্ত্রকে বাগে আনতে গিয়ে একদিকে যেমন সে নিজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি আর সবাইকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। Chaplinesque অ্যাকশনের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটল এখানে।

কারখানার মালিকের একমাত্র নজর—কেমন করে বেশি খাটানো যায় মজুরদের, টিফিনের সময়টাকে কমিয়ে না দিলেই নয়। ভেবে-চিন্তে, খেটেখুটে মালিক এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করল, যে যন্ত্রের সাহায্যে খেতে গিয়ে মজুরদের এতটুকু কায়িক পরিশ্রম করতে হবে না এবং খাওয়াটাও হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। টিফিনের সময় মজুর চার্লি যন্ত্রের সামনে এসে দাঁড়াতেই অমনি যান্ত্রিক কসরত শুরু হলো, যার ফলে চার্লিকে হতে হলো নাকালের একশেষ। খাওয়া তো হলোই না, যন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কায়িক পরিশ্রম বেড়ে গেল শতগুণ।

দিনের পর দিন মজুরের কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে চার্লির ভেতরে এক স্নায়বিক বিকৃতি দেখা দিল, পথেঘাটে, যেখানে-সেখানে পাগলামি শুরু করে দিল সে। ফলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হলো চার্লি এবং স্নায়বিক বিকৃতির দরুন তাকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। কিছুদিনের চিকিৎসার পর চার্লি যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল তখন সে সম্পূর্ণ বেকার। কারখানার একটা চাকরি অবশ্য পেল কিন্তু কয়েক ঘণ্টা কাজ করতে না করতেই মজুরের দল ধর্মঘট শুরু করে দিল।

কারখানার ফটকের বাইরে বিক্ষুব্ধ মজুরের দল ভিড় করে রয়েছে। তাদের মধ্যে চার্লিকেও দেখা গেল। পুলিশ এসে দাবড়ানি দিয়ে ভিড় সরিয়ে দিল। পুলিশের দাঁত-খিঁচুনিতে ভড়কে গিয়ে চার্লি দৌড়ে উঠল এক চলমান লরিতে। লরিটি নানারকম বিস্ফোরণের মাল মসলায় ঠাসা।

আচমকা একটা ধাক্কায় চার্লি লরি থেকে রাস্তায় পড়ে গেল এবং তার সঙ্গে ভেঙে পড়ল লরিতে আটকানো একটি সাবধানী নিশান। চার্লি উঠে দাঁড়াল, দেখল নিশান ফেলে গাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। লরির ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য চার্লি নিশানটা তুলে ধরে ওড়াতে লাগল। নিশানের রঙ লাল।

ঠিক সেই সময়ে এক কমিউনিস্ট মিছিল দেখা দিল রাস্তায়। পুলিশ দেখল মিছিলের সামনে কে এক বেঁটে খাটো মনুষ লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে এগোচ্ছে। মিছিলের নেতা মনে করে চার্লিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে একটি মেয়ের সঙ্গে চার্লির ভাব হলো। ছোট বোন ছাড়া পৃথিবীতে এর আর কেউ নেই। ছোট বোনটি অনাথ-আশ্রয়ে পালিত হচ্ছে, কিন্তু এই মেয়েটি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে বাইরের পৃথিবীতে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি সামান্য কিছু খাবার চুরি করেছে। তাই, সাতপাঁচ ভেবে চুরির দোষটা নিজের ঘাড়ে নেওয়ার জন্যে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। অবশ্য সে-যাত্রায় জেলে যাওয়া তার আর হলো না। তার বদলে মেয়েটির সঙ্গে তার এক গভীর সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল।

দুজনে মিলে এক ভাঙা বাড়িতে তারা স্বর্গ রচনা করল। কিন্তু এই স্বর্গ-সুখ কেমন করে কায়েম হবে যদি না প্রাণ ধারণের সামান্যতম ব্যবস্থাও তারা করে। অনেক চেষ্টা করেও যখন কিছু হয় না, এমনি সময় হঠাৎ একটা চাকরি জুটে গেল চার্লির, অবশ্য তার কিছু পরেই কয়েকজন চোরকে আশকারা দেওয়ার অপরাধে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো কারাবরণ করতে হলো। বলা বাহুল্য, এবারে চার্লি জেলে যাওয়ার কথা একবারের জন্যেও ভাবেনি।

জেল থেকে এবার ফিরে এসে চার্লি দেখল মেয়েটি একটি হোটেলে এক নাচিয়ের চাকরি পেয়েছে। প্রেমিকার চেষ্টায় চার্লিও সেখানে ছোটখাটো একটা চাকরি পেল। মজার কিছু ঘটনা ঘটার পর কর্তার মন জুগিয়ে চলতে পারল না বলে দুজনকেই আবার বেরিয়ে আসতে হলো রাস্তায়।

সামনে অন্তহীন রাস্তা। বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে কাছাকাছি দাঁড়াল দুজন। তারা বলল, 'We'll get along' তারপর সঙ্গিনীর হাত ধরে খুদে ভবঘুরে টুকটুক করে এগিয়ে চলল।

বরাবর যেমন হয়ে এসেছে MODRN TIMES-এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না, দর্শক-সমাজে যথারীতি সমাদৃত হলো ছবিটি। কিন্তু এবার একটা নতুন ব্যাপার যা লক্ষ করা গেল তা হলো সমালোচক মহলের প্রতিক্রিয়ার রকমফের। কেউ বললেন, বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে যন্ত্র যুগের বাস্তব সমস্যার যথাযথ শিল্পায়ন হয়েছে ছবিটিতে, কেউ বা ছবিটিকে কমিউনিস্ট উগ্রতার জন্য বেমালুম নাকচ করেই দিলেন, আর কারো মতে উদ্দেশ্য যেমনই থাকুক না কেন– সমাজ সমস্যার বিশ্লেষণ বাস্তবানুগ হয়নি। শেষোক্ত প্রতিক্রিয়াটি এসেছিল প্রধানত সোভিয়েত দেশের সমালোচকদের কাছ থেকে—তাদের মতে MODERN TIMES-এ চ্যাপলিন যন্ত্র-যুগকে ছোট নজরে দেখেছেন। যন্ত্রের অসীম সম্ভাবনাকে তিনি বাস্তবসম্মত উপায়ে তুলে ধরতে পারেননি। যাঁরা ছবির মধ্যে কমিউনিস্ট প্রচারের উগ্রতার সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন সেই রক্ষণশীল দল যাঁরা বহুদিন ধরেই নানা কুৎসিত উপায়ে চ্যাপলিনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। এই দলটি যে শুধু আমেরিকাতেই তৎপর হয়ে উঠেছিল তা নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেই এইরকম অল্পবিস্তর ঘটল। চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ফ্যাসিস্ট-শাসিত জার্মানি ও ইতালিতে— রাষ্ট্রীয় কর্তারা MODERN TIMES ছবির প্রদর্শন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু মস্ত উত্তেজনা, প্রতিক্রিয়া ও 'প্রচার'-এর অভিযোগের মুখে চ্যাপলিন স্পষ্ট জবাব দিলেন,—

'Nonsense! I was only poking fun at the general confusion from which we are all suffering,'

কাহিনীর কোন জায়গাটা কতখানি কমিউনিস্টধর্মী হলো বা কতটুকু প্রতিক্রিয়াশীল হলো তা নিয়ে চ্যাপলিন মাথা ঘামাতে রাজি নন—সমস্ত দরদ, আবেগ আর তীব্রতা দিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে যা তিনি ফুটিয়ে তুলতে

চেয়েছিলেন তা হলো আধুনিক যুগের পর্যুদস্ত মানুষের কথা। কথাটাকে এক জায়গায় তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন,—

'The things I tried to say in this film are very close to everyone. I know of a factory where the workers were fined if they went to the urinals too often. Everyone knows there are salesmen who have to maintain an incredible pace of salesmanship, continually diven by their bosses, and the ones with lowest sales are automatically discharged with on excuse accepted. You know about the things. Then you must not object if I put them on screen and satirise them.'

বাস্তবিকই তাই। চ্যাপলিন তাঁর চার্লিকে বহু পথ অতিক্রম করিয়ে এবার ঠেলে দিলেন ১৯৩৬-এর হট্টগোলের মধ্যে এবং সেখানে নানাভাবে নিজেকে খাওয়াতে গিয়ে অর্থাৎ 'জাতে' তুলতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়ে ভবঘুরেটি ফিরে এল বাইরে। ভবঘুরের ব্যর্থতায়; বিপর্যয়ে, লাঞ্ছনায় একদিকে যেমন বরাবরের মতো হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, অন্যদিকে তেমনি সমাজের চালু মূল্যবোধগুলোর অসারতার প্রমাণ পেয়েও সেগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন হতে দেখে পৃথিবীর শতকরা নব্বইজন মানুষ প্রাণ খুলে হেসে উঠল। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত চ্যাপলিনের শিল্প-সৃষ্টিতে বিদ্রূপই হলো প্রথম ও প্রধান কথা, এটাই হচ্ছে তাঁর বৈশিষ্ট্য। চ্যাপলিনের শিল্প-বিচারে এই কথাটাকে ভুললে চলবে না।

অবশ্যই এরপর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সভ্যতার সঙ্কট যখন ক্রমেই পাকিয়ে উঠতে লাগল তখন দেখা গেল বিদ্রূপ ছাড়িয়েও শিল্পী চ্যাপলিন যেন আরো একটা কিছু বলতে চান, এবং নিজের ভেতর থেকে তাগিদ এসেছিল বলেই MODERN TIMES শেষ করেই ভবিষ্যতের চার্লি সম্পর্কে চ্যাপলিন বললেন,—

'In the new film he will not be quite so nice, I am sharpening the edge of his character so that people who have liked him vaguely will have to make up their minds.'

সভ্যতার সে এক দারুণ দুর্যোগ। চারদিকে তখন চলেছে এক অসভ্য উন্মত্ততা। এদিকে গোটা পৃথিবীকে হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে আনার জন্যে এক কুৎসিত নকশায় মেতে উঠেছে জার্মানির হিটলার, ইতালির মুসোলিনি আর জাপানের টোজো। অন্যদিকে এই ফাশিস্ত বর্বরতার পক্ষপুটে আশ্রয় পেয়ে ফেঁপে উঠেছে স্পেনের ফ্রাংকো, গ্রিসের পশুশক্তি এবং আরো কিছু গজিয়ে-ওঠা চক্রান্ত। সমস্ত জার্মানিকে এক জঘন্য মারণমন্ত্রে দীক্ষিত করার কাজে লাগিয়েছে ফ্যাসিস্ট হিটলার আবিসিনিয়ায় বিশ্রী জুলুম চালিয়েছে, মুসোলিনি সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণে চীন পর্যুদস্ত আর সমস্ত গণতন্ত্রী শক্তিকে সমূলে উৎপাটন করতে কোমর বেঁধে লেগেছে ফ্রাংকো ও গ্রিসের রাজতন্ত্র আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে বেঁচে থাকার দুরন্ত আশা নিয়ে লড়ছে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ। পশ্চিম ইউরোপে এমন কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তি নেই যে এই সভ্যতার বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, এমন কোনো রাষ্ট্রীয় নেতা নেই যে সভ্যতার এই সংকটের মুহূর্তে মানুষের সপক্ষে একটা সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করতে পারেন। পক্ষান্তরে দেখা গেল, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন কাপুরুষের মতোই মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে এলেন এবং সেই চুক্তিতে সম্মতি জানাল প্রতিবেশী ফ্রান্স। তারপর চারদিকের এই ছড়ানো বীভৎসতা, ছড়ানো অব্যবস্থা, ছড়ানো জুলুম জড়ো হয়ে একদিন দেখা দিল বিশ্বযুদ্ধ—সমস্ত তল্লাট জুড়ে হন্যে কুকুরের মতো ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল যুদ্ধবাজের দল। এবং এই চূড়ান্ত ওলটপালটের মধ্যেই চার্লি চ্যাপলিন তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ভবঘুরের সম্পর্কে বললেন, 'I am sharpening the edge of his character.'

১৯৪০ সালে চ্যাপলিন দর্শকের সামনে হাজির করলেন তাঁর নতুন ছবি—THE GREAT DICTATOR, শুধু ভবঘুরে চরিত্র-চিত্রণেই নয়—চ্যাপলিন এবার আঙ্গিকের দিক থেকেও এক মস্ত পরিবর্তন আনলেন। সবাইকে তাক লাগিয়ে এবার তিনি ছবিতে শব্দ যোজনা সম্পর্কে তাঁর পুরোনো ধারণাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিতে এতটুকু

ইতস্তত করলেন না। তার ওপর গভীর, ব্যাখ্যাযুক্ত ভবঘুরের পোশাকটিকেও আংশিকভাবে বর্জন করা হলো এখানে—ছবিতে দুটো চরিত্রে অভিনয় করলেন চ্যাপলিন। চরিত্র দুটোর একটি হলো এক নগণ্য ইহুদি নাপিতের ভূমিকা যা ভবঘুরের চরিত্রেরই পরিমার্জিত সংস্করণ, আর একটি টোমানিয়া রাজ্যে সর্বময় কর্তা ডিক্টেটর হিংকেল। সিনেমা-রসিকদের কেউ কেউ চ্যাপলিনের এই 'অহেতুক' খেয়ালের সমালোচনা করতে ছাড়লেন না; বিশেষ করে কাহিনীর শেষে ছয় মিনিট ধরে ইহুদি–নাপিতের একটানা গুরুগম্ভীর বক্তৃতা তাদের কাছে রীতিমতো বিসদৃশ ঠেকল। চ্যাপলিন আগে থেকেই এই ধরনের সমালোচনার জন্যে তৈরি ছিলেন—আগে থেকেই তিনি তাঁর সৃষ্ট চার্লির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেছিলেন—

'In the new film he will not be quite nice.....people who have liked him vaguely will have to make up their minds.'

কিন্তু তবু এই বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখে চ্যাপলিন চুপ করে রইলেন না। ছবিতে যা কিছু নতুনত্বের প্রবর্তন তিনি করলেন তা পুরোপুরি জেনে শুনেই করলেন। তাই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে এত দিন তিনি সবাইকে হাসিয়েছেন বলে আজ বক্তব্য প্রকাশের তাগিদে তাঁর কি কিছু শোনাবার অধিকার নেই।

অবশ্যই আছে। গত কয়েকটা বছর পৃথিবীর সমস্তটা জুড়ে যে চরম বিশৃঙ্খলা চলেছে যার পরিণতি ঘটেছে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের উলঙ্গ বর্বরতায়, তা শিল্পী চ্যাপলিনের মনে জ্বালিয়ে তুলল ঘৃণার আগুন, সভ্যতার এই দারুণ সংকটে অশান্ত হয়ে উঠল তাঁর আত্মা। তাই বহুদিনের সঞ্চিত জীবনের যত ব্যর্থতা, যত জ্বালা, যত তীব্রতা, সব বুকে চেপে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বলতে, শোনাতে। গত দুটি মহাযুদ্ধের ভেতরকার সময়ের মধ্যে তিনি কাহিনীকে বাঁধলেন—যে সময়টা চ্যাপলিনের ভাষায় 'অসভ্য উন্মত্ততায় জর্জরিত, স্বাধীনতা যখন কর্তিত, মানবতা যখন পদে পদে লাঞ্ছিত'।

চ্যাপলিন এযাবৎ যত ছবি করেছেন, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ ছবি হলো THE GREAT DICTATOR-তের রিলের ছবি, কিন্তু মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তিনি শুটিংয়ের সমস্ত কাজ সমাধা করতে পেরেছিলেন। প্রধান স্ত্রী-ভূমিকায় নামলেন চ্যাপলিনের তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রী পলেট গডার্ড, এবং চিত্র-গ্রহণে টুথেরোর-র সঙ্গে একজন ক্যামেরাম্যান এই ছবিতে প্রথম কাজ করলেন। ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হলো নিউইয়র্কে—১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে।

দ্বিতীয়বারের মতো সৈনিক বেশে দেখা দিল চার্লি। ১৯১৮ সালের মহাযুদ্ধ। চারদিকে শুধু সৈন্য, ট্রেঞ্চ আর কাঁটাতারের বেড়া,—গোলা গুলির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারদিক। চার্লি জাতে ইহুদি, ছাপোষা নাপিত—কিন্তু টোমানিয়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কর্তাদের হুকুমে পেশা ছেড়ে তাকে নাম লেখাতে হয়েছে সৈন্যদলে। ছবি শুরু হতেই দেখা গেল টোমানিয়ার সৈন্যদল গির্জা নোতরদাম থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে তৈরি হয়ে রয়েছে। ভারী ভারী কামানগুলো মুখিয়ে রয়েছে গির্জার দিকে, ওপরওয়ালার হুকুম এলেই কাজ শুরু হবে। হুকুম তামিল করতে চার্লিও প্রস্তুত।

কিন্তু হঠাৎ করে এক বিপদ দেখা দিল। মাথার ওপর শত্রুপক্ষের উড়োজাহাজের ঠিকানা পেয়েই তাড়াহুড়ো করে সবই ঢুকল ট্রেঞ্চে। কিন্তু সেখানে গিয়েও কোনো নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই। হাঁটা পথেও দেখা গেল শত্রুপক্ষে এগিয়ে আসছে।

সবচেয়ে বেয়াড়া অবস্থায় পড়তে হলো চার্লিকে। বেচারা একে তো এই সমস্ত হইচই গোলমালে একেবারে অভ্যস্ত নয়, তার ওপর যখন তাকে আক্রমণের মুখে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে ঠেলে দেওয়া হলো তখন পুরোপুরি সৈনিকসম্মত উপায়ে সেই দায়িত্ব পালন করা তো দূরের কথা—রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে সৃষ্টি করে তুলল নানা অনর্থের। অবশ্য এই সমস্ত অনর্থের মধ্যেও হঠাৎ সে একটা ভালো কাজও করে বসল—ভালো কাজ করবে বলে নয়, কেমন করে যেন তা ভালো হয়ে গেল। শুল্‌টজ্‌ নামে এক পাইলটের সঙ্গে চার্লি এক উড়োজাহাজে উড়ছিল—

যুদ্ধের কাজেই। হঠাৎ মেশিন বিগড়ে যেতেই উড়োজাহাজটি উল্টে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল মাটির সঙ্গে। মেশিনের সঙ্গে সঙ্গে শুল্‌টজ্‌-এর মাথাটাও বিগড়ে গিয়েছিল, বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো বিড়বিড় করে আপন মনে বলে চলছিল—

Ah, Spring in Tomania! Hilda would be in her garden now with her daffodils.....

উড়োজাহাজ তখন তীব্রভাবে নেমে আসছিল মাটির দিকে। তারপর, ধাক্কা লেগে সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার পরেও দেখা গেল শুল্‌টজ্‌ অচৈতন্য অবস্থায় বকবক করেই চলেছে।

'Hilda ... a beautiful soul and she loved animals and little children too.'

হয়তো বকবক করতে করতে মরেই যেত শুল্‌টজ্‌ কিন্তু চার্লি সঙ্গে থাকার দরুন সহজেই সে সুস্থ হয়ে উঠল।

এই দুর্ঘটনায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সবকিছুই, শুধু ঠিক রইল মানুষ দুজন। যুদ্ধে অনেকেরই টনক নড়ল, আর এই ধাক্কায় নড়ল চার্লির টনক। এমনই নড়ল যে যুদ্ধের কয়েকটা বছরের কথা চার্লি বেমালুম ভুলে গেল।

যুদ্ধ খতম হলো, টোমানিয়া হেরে গেল, কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসার আগেই টোমানিয়ার রাজনৈতিক জীবনে অনেক কিছু ওলটপালট হলো, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল এবং তার প্রভাব এসে পড়ল টোমানিয়া রাষ্ট্রেও। দাঙ্গা শুরু হলো টোমানিয়ার এবং এই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যেই হিংকেল-এর দল রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে বসল।

হিংকেল বক্তৃতা দিচ্ছে, মাইক্রোফোন ও লাউডস্পিকার সমস্ত শহর গেছে ছেয়ে। বক্তৃতা হচ্ছে জার্মান ভাষায়, সঙ্গে সঙ্গে চলছে ইংরেজি অনুবাদ। হিংকেল বলছে, 'কালও টোমানিয়া পদানত ছিল, কিন্তু আজ আমরা জেগেছি।' বলেই চলেছে হিংকেল, বলতে বলতে গলা তার শুকিয়ে যাচ্ছে, দেহের উত্তাপ যাচ্ছে বেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গলাটা একটু

ভিজিয়ে নিয়ে, ট্রাউজারের ভেতরে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে আবার চলল তার বক্তৃতাবাজি। হিংকেল বলল, 'Democratia Shtunkl' (গণতন্ত্র দুর্গন্ধময়)। সে বলল, 'Libertad Shtunk !' (স্বাধীনতা ঘৃণ্য), 'Frei Sprachen Shtunk !' (স্বাধীন মত আপত্তিজনক)। এই ধরনের কিছু কিছু বাণী দিয়েই হিংকেল জানাল যে টোমানিয়ার সামরিক শক্তি আজ অপরাজেয়, কিন্তু দেশবাসীকে আজ আত্মত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হতে হলে।—'Tighten der belten.'

হিংকেল যতই উত্তেজিত হয়ে উঠছে ততই তার কথাগুলো যাচ্ছে জড়িয়ে এবং কিছুক্ষণ পরেই কী বলছে সে কিছুই বোঝার আর উপায় রইল না। এমনকি ঝড়ের বেগে কথার পিঠে কথার ধমকে মাইক্রোফোনগুলো পর্যন্ত ভয়ে শুকিয়ে পড়েছে, গুটিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অনুবাদক ছোট কথায় জানিয়ে দিল যে ডিক্টেটর নাকি এতক্ষণ ইহুদিদের সম্পর্কে বলছিল। হিংকেল বলল, 'all shtunken !'—শুধু টোমানিয়া ছাড়া।

অনেকদিন হাসপাতালে থেকে ইহুদি নাপিত ফিরে এসেছে শহরে। টুকটুক করে হেঁটে সে এল ইহুদিপাড়ায়, মাথার গোলমালে যুদ্ধের কয়েকটা বছর তার স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। ইহুদিপাড়ায় এসে চারিদিকে সমস্ত কিছু দেখে চার্লি তাজ্জব বনে গেল। ঝটিকা-বাহিনী অনবরত রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ করে চলেছে, সঙ্গে চলেছে গান—

'The Aryans, the Aryans; as we go marching by.'

সামনে ইহুদিদের যা কিছু চোখে পড়েছে সমস্ত কিছুই ভেঙেচুরে এগিয়ে চলেছে ঝটাক–বাহিনী আর ইহুদিরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে লুকিয়ে পড়ছে যেখানে-সেখানে। মা-বাপ মরা মেয়ে হান্‌না এসব দেখে চুপ করে থাকতে পারেনি, রাগে দুঃখে ফেটে পড়ল সে, চেঁচিয়ে উঠল, 'শুয়োরের বাচ্চারা !'—সঙ্গে সঙ্গে ঝটিকা-বাহিনীর জাঁদরেল মানুষগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল হান্‌নার ওপর।

ইহুদি-নাপিত-চার্লি তার চুল কাটার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক বছর পরে এই প্রথম দরজা খোলা হলো দোকানের।

কয়েকটা বেড়াল বাচ্চা চার্লিকে অভ্যর্থনা জানাল। ঘরে ঢুকে বহুদিনের সঞ্চিত ধুলো ঝাড়ামোছা করছে চার্লি, এমন সময়ে ঝটিকাবাহিনী ঢুকল সেখানে—'Heil Hynkel!' ছাপোষা নাপিত এই নামটি আগে কখনো শোনেনি, তাই সরল মনে জিজ্ঞাসা করল, 'Who is he?' জবাবে বিস্তর মার খেল চার্লি। ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলল লোকগুলো। শেষ পর্যন্ত চার্লিকে তারা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এল বাইরে এবং ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখল!

ঠিক এই সময় গাড়ি করে যাচ্ছিল টোমানিয়া রাষ্ট্রের এক হোমরা-চোমরা অফিসার—গত মহাযুদ্ধের পাইলট শুল্‌টজ্‌। চার্লিকে দেখেই সে চিনে ফেলল—এই লোকটা তো তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। শুল্‌টজ্‌ বলল—

'You' don't you remember me—the war—you saved my life-strange, and I always thought of you as an Aryan.'

জবাবে চার্লি বলল, 'I am a vegetarian.'

যাই হোক, শুলটজ্‌-এর আদেশক্রমে ঝটিকা-বাহিনী চার্লিকে ছেড়ে দিল। এর পর, লোকগুলো যখন আবার হাননার ওপর পড়ল তখন চার্লি গিয়ে দাঁড়ালেন তাদের মধ্যে, বলল, 'আমার বন্ধু।' মেয়েটি সে যাত্রায় রেহাই পেল।

রাষ্ট্রীয় দপ্তরে হিংকেলের কাজের অন্ত নেই, আর তার কাজের সহায়তা করতে গিয়ে জোঁকের মতো লেগে রয়েছে গারবিশ ও হেরিং। নানা কাজের মধ্যে ফটোগ্রাফার এল ডিটেক্টরের ছবি তুলতে, ভাস্কর এল পাথরের মূর্তি খোদাই করতে। এসবের জন্যও কিছু কিছু সময় হিংকেলকে দিতে হলো। এর মধ্যে হেরিং এসে জানাল যে দর্জি এসেছে এক নতুন ধরনের পোশাক নিয়ে। পোশাকটি দেখতে অবিকল সিল্ক-এর মতো, কিন্তু আসলে বন্দুকের গুলিও তা ভেদ করতে পারে না। অকারণ বাক্যব্যয় না করে হিংকেল দর্জিকেই বলল পোশাকটা পরতে এবং নিজে গুলিভরা রিভলবারটা তুলে ধরল। গুলি ভরতেই পোশাক ভেদ করে

বেচারা দর্জির শরীরটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল লোকটা। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হিংকেল মন্তব্য করল, 'Far form perfect.

এক মেয়ে কর্মচারী হিংকেলের ঘরে ঢুকেছে কাজে। হিংকেল তাকে দেখতে পেয়েই যেন কেমন হয়ে গেল, জানোয়ারের মতো ফোঁস ফোঁস করতে করতে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু হিংকেল তখন পাশবিক উত্তেজনায় মত্ত। ঠিক এমনি সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল, সরকারি প্রয়োজনে হেরিং টেলিফোন করছে। সঙ্গে সঙ্গে হিংকেলের মধ্যে ফিরে এল ডিক্টেটর সুলভ মেজাজ। মেয়েটাকে ছেড়ে দিতেই সে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে আর হিংকেল ডিক্টেটরের ঔদ্ধত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেরিং–এর অপেক্ষায়।

এমনি অনেক কিছু ঘটল টোমানিয়া রাজ্যে। চারদিকে বিশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে ডিক্টেরর হিংকেলের জবরদস্তি বেড়েই চলল দিনের পর দিন।

একদিন হিংকেলকে জানানো হলো কোনো এক কারখানায় তিন হাজার মজুর ধর্মঘট করেছে। সঙ্গে সঙ্গে হিংকেলের হুকুম হলো, তিন হাজার মজুরকেই গুলি করে মেরে ফেলা হোক, কারণ সে রাজ্যে একজন মজুরকেও অসন্তুষ্ট রাখতে রাজি নয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত হুকুম তুলে নিতে হলো, কারণ মজুরদের এমনি করে নিঃশেষ করে ফেললে কাজ করবে কে!

গারবিশ আর হিংকেল বসে রয়েছে পাশাপাশি। গারবিশ বলছে, আর্য-জাতির সর্বময় কর্তৃত্ব ছাড়া পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না এবং পৃথিবীর সেই শ্রেষ্ঠ জাতির একমাত্র নেতা হচ্ছে হিংকেল।

গারবিশ বলল, 'আপনি হবেন পৃথিবীর সর্বময় কর্তা!'

হিংকেল বলল, 'সমস্ত পৃথিবীর সর্বময় কর্তা!'

গারবিশ বলল, 'পৃথিবীর মানুষ আপনাকে ভগবান বলে মানবে।' হিংকেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওসব আমাকে বলো না, তোমার কথা শুনলে এক এক সময়ে বড়ো ভয় করে।'

কিন্তু গারবিশকে থামানো সম্ভব নয়, বলল, 'দেশের পর দেশ আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়বে।'

হিংকেল ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

হিংকেল একা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গ্লোবের সামনে—তার লোলুপ-দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে গ্লোবটার ওপর। গ্লোবটাকে আলতোভাবে হাতে তুলে নিল হিংকেল, আলগোছে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তারপর কখনো টোকা মেরে, কখনো লাথি মেরে, কখনো মাথা দিয়ে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে গ্লোবটাকে নাচাতে লাগল। এক প্রচণ্ড অস্বস্তিকর উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল সমস্ত পৃথিবীর ভাবী সম্রাট। উত্তেজনার আতিশয্যে যখন হিংকেল গ্লোবটাকে দ্বিতীয়বারের মতো জড়িয়ে ধরল, তখন হঠাৎ ফেটে গেল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল পৃথিবীর ভাবী অধীশ্বর, টেবিলের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

পৃথিবী জয়ের চক্রান্ত সমানে চলেছে। শুলটজের সঙ্গে হিংকেলের মতবিরোধ ঘটল। শুলটজ জানাল যে হিংকেলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। হিংকেল চেঁচিয়ে উঠল, 'Traitor, Democrat।'—শুলটজ্‌ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো।

ইহুদিদের ওপর জুলুম বেড়েই চলেছে। নাপিত চার্লির দোকানে ঝটিকাবাহিনী হানা দিল। শুলটজ-এর সঙ্গে পরিচয় রয়েছে বলেই ঝটিকাবাহিনী ছাপোষা নাপিতের ওপর জুলুম করতে এসেছে। কিন্তু নাগাল পাওয়ার আগেই চার্লি আর হাননা নানা কৌশলে লোকগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল। দূরে একটা বাড়ির ছাদ থেকে ওরা দেখতে পেল দোকানটায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাননা বলল,—

'Never mind, we can start over again in Austerlich.'

চার্লি কিন্তু অস্টারলিখ পর্যন্ত পৌছতে পারল না, তার আগেই সে ধরা পড়ল। শুলটজ্‌ ও ঝটিকা বাহিনীর নজর এড়াতে পারল না। এক বুড়ো ইহুদির সঙ্গে কেবলমাত্র হাননা গিয়েই পৌঁছল অস্টারলিখ রাজ্যে।

সেখানে থেকে হান্না চার্লিকে চিঠি লিখে জানাল যে তার জন্য সে অপেক্ষা করে থাকবে।

হিংকেল অস্টারলিখ-অভিযানের আদেশ দিল। কিন্তু গারবিশ এসে খবর দিল যে ব্যাকটেরিয়া রাষ্ট্রের ডিক্টেটর নাপালনি অস্টারলিখ-সীমান্তে ষাট হাজার সৈন্য মজুত রেখেছে। খবরটা শুনেই হিংকেল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। আস্পর্ধা!—অনতিবিলম্বে নাপালনির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা না করলেই নয়।

ব্যবস্থা হলো। গর্বস্ফীত নাপালনি এবং তার চেয়েও ঢের বেশি উদ্ধত হিংকেল-কে নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটানো, এবং শেষ পর্যন্ত চুক্তি হলো যে নাপালনি তার সৈন্যদল সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে হিংকেলের অস্টারলিখ–অভিযান শুরু হবে। ইতিমধ্যে চার্লি আর শুল্‌টজ্‌ জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে। আর এক মুহূর্তের জন্যও টোমানিয়া রাষ্ট্রে থাকাটা উচিত নয় বলেই তারা অস্টারলিখের সীমান্ত প্রায় পেরিয়ে গেছে। প্রয়োজনবোধে ডিক্টেটর-হিংকেলকে তখন চলতে হচ্ছে ছদ্মবেশে। একটা মজার ঘটনা ঘটল এই সময়ে। ঝটিকা-বাহিনী চার্লি আর শুলটজ্‌কে খুঁজতে খুঁজতে পেল ছদ্মবেশী হিংকেলকে। হিংকেলকেই তারা ইহুদি-নাপিত বলে মনে করল, প্রচণ্ড মারধর করে তাকে তারা নিয়ে গেল জেলে।

ওদিকে বিনা রক্তপাতে অস্টারলিখ জয় করে বিজয়গর্বে সাম্রাজ্যবাদের ধুরন্ধর আমলারা ছাপোষা নাপিতকে পৃথিবীর ভাবী অধীশ্বর ডিক্টেটর-হিংকেল বলে ভুল করল। বিজিত অস্টারলিখবাসীদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো এই খুদে মানুষটিকে—'পৃথিবীর ভাবী সম্রাটকে কিছু বলবার জন্য এগিয়ে দেওয়া হলো। ভয় কম্পিত কণ্ঠে নাপিতটি বলতে শুরু করল :

I am sorry, but I do not want to be an Emperor. That is not my business..... I should like to help everybody—if possible—jew, gentile, blackman, white—The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way,

Greed has poisoned men's souls.'

ধীরে ধীরে নাপিতের মনে অবিশ্বাস্যভাবে এল শক্তি, অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলে উঠল আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে :

The hate of men will pass, and the dictators die, and the power they took form the people will return to the people. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in man. cries out for universal brotherhood, for the unity of us all—Soldiers! Do not give yourselves to these brutes—men who despise you, enslave you, regiment your lives, treat you like cattle and use you as cannon—fodder—you are not machines. You are men! you have the love of humanity in your hearts—Soldiers! do not fight for slavery. Fight for liverty—you, the people have the power—the power to create macnines, the power to create happiness. You people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.'

অদ্ভুত প্রেরণার আমেজে উন্মাদ হয়ে খুদে মানুষটি বলে চলল,—

'The clouds are lifting—the sun is breaking through—we are comming out of darkness into a new world where men will rise above their hate, their greed and their brutality. The soul of men has been given wings and at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow, into the life of hope, into the future—into the glorious future that belongs to you—to me—and to all of us.'

শিরদাঁড়াভাঙা পোড়খাওয়া মানুষের দল আত্মবিস্মৃত হয়ে শুনে চলেছে 'পৃথিবীর ভাবী অধীশ্বরের' কথা। টোমানিয়া রাজ্য থেকে পালিয়ে

আসা বৃদ্ধ ইহুদির পাশে দাঁড়িয়ে হান্‌নাও শুনছে কথাগুলো।

বৃদ্ধ বলল, 'শুনছ !'

হান্‌না বলল, 'চুপ !'

হান্‌নার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে, হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছে। চোখেমুখে তার অপূর্ব দীপ্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই THE GREAT DICTATOR পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুক্তি পেল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ছবিটি আশানুরূপ টাকা তুলতে পারল না। অবশ্য এ থেকে কেউ যদি ভেবে বসেন যে চ্যাপলিনের এই নতুন ধরনের ছবির মধ্যে সাধারণ মানুষের ভালো লাগার মতো তেমন কিছু ছিল না, তাহলে কিন্তু মস্ত ভুল হবে। আসলে চ্যাপলিন এই ছবির মারফত আর একবারের মতো সাধারণ মানুষের কথাই বলতে পারলেন সাধারণ মানুষের তরফ থেকে। গত কয়েকটা বছরের চরম অব্যবস্থার কথা আর তারই চাপে পড়ে সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনার কথা—তার বেঁচে থাকার দুরন্ত কামনার কথা—দুনিয়ার দরবারের সভ্যতার এই সঙ্কটের মুহূর্তে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলার সুযোগ পেলেন। সেই সুযোগ চ্যাপলিন ছাড়লেন না। তিনি তার ছবির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেন,—

'I wanted to see the return of decency and kindness. I am no Communist—just a human being who wants to see this country a real democracy and freedom form this internal regimentation which is crawling over the rest of the world.'

কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল দলের নানা ধরনের উসকানির জন্যই THE GREAT DICTATOR বিষয় মাহাত্ম্যে ও আঙ্গিকে বলীয়ান হয়েও ব্যবসার ক্ষেত্রে তেমন সুবিধে করে উঠতে পারল না। শুধু আমেরিকাতেই নয়, ইউরোপের দেশেও কিছু কিছু দল এমনকি রাষ্ট্রীয় কর্তাদের কেউ কেউ এই ছবির বিরুদ্ধে নানারকম প্রচারকার্য চালালেন। কয়েকটি দেশে আইন করে ছবিটিকে বন্ধ করে

দেওয়াও হলো। প্রচার করা হলো, চ্যাপলিন কমিউনিস্ট, তার ছবি জনস্বার্থবিরোধী। অর্থাৎ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের সপক্ষে বলাটাই হচ্ছে চ্যাপলিনের মস্ত অপরাধ।

কিন্তু চ্যাপলিন এতটুকু বিচলিত হলেন না। বক্তব্য প্রকাশের তীব্র তাগিদে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক মারফত তিনি তাঁর শিল্পী জীবনে যে বিরাট বিপ্লব ঘটালেন তার দায়িত্ব সবটাই তিনি মাথা পেতে নিলেন। এবং এই কয়েকটা বছরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এতখানি বাস্তবমুখীন হয়ে উঠেছিল যে ছবিটির পরিণতির কথা বলতে গিয়ে তিনি পরিষ্কার জানালেন,—

'It would be much easier to have barbar and Hannah disappear over to the horizon, off to promised land against the growing sunset. But there is no promised land for the oppressed people of the world. There is no place over the horizon to which they can go for santary. They must stand and we must.'

এমনি করেই বহির্জগতের প্রচণ্ড ধাক্কায় চ্যাপলিনের শিল্পী-মনের এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটল।

THE GREAT DICTATOR শেষ করে যুদ্ধের কয়েকটা বছর খোলাখুলিভাবে চ্যাপলিনের কয়েকটি রাজনৈতিক ভাষণ ও কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রীয় কর্তাদের রীতিমতো সন্দিগ্ধ করে তুলল। ১৯৪২ সালের নিউইয়র্কের এক সভায় তিনি বাণী পাঠালেন, 'রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে।' এবং কিছু দিন পরেই তিনি প্রকাশ্য সভায় ইউরোপের পশ্চিম সীমান্তে 'Second front' খোলার দাবি জানালেন। প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট সুরকার হ্যানস্ আইসলারকে যখন আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলেছে, তখন তিনি তাঁর তীব্র প্রতিবাদ করলেন, এবং এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে সমস্ত বুদ্ধিজীবীকে জড়ো করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর পাব্‌লো পিকাসোকে চিঠি লিখলেন।

এই সমস্ত এবং আরো ছোটখাটো অনেক ঘটনায় ও প্রকাশ্যে

হলিউডকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের তল্পিবাহক বলায় ওয়াল স্ট্রিটের কর্তারা রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং পরবর্তীকালে যখন An-American Activities Committee-র কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর হুমকি দেওয়া হলো তখন তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আমি কমিউনিস্ট নই, আমি শান্তিবাদী।'

চ্যাপলিনের গতিবিধির ওপর কড়া সরকারি নজর পড়ল! তাঁর সমস্ত কিছুকেই গভীর সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন রাষ্ট্রের কর্তারা। প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র থেকে নানা ধরনের প্রশ্ন এসে চ্যাপলিনকে উদ্ব্যাস্ত করে তুলল। স্থিরচিত্তে চ্যাপলিন তাঁর যা বলবার বললেন, যা করণীয় তা-ই করলেন। প্রশ্ন উঠল, সেই ১৯১৩ সাল থেকে চ্যাপলিন আমেরিকাতেই বসবাস করছেন অথচ কেন তিনি এখনও আমেরিকার নাগরিক হননি ! জবাবে চ্যাপলিন বললেন,—

'I am a citizen of the world. I am an internationalsit, not a nationalist and that is why I do not take out citizenship.'

এই সম্পর্কে চ্যাপলিন আর এক জায়গায় বললেন, 'যদি আমাকে কখনো নাগরিক পত্র নিতেই হয় তো আমি হব অ্যান্ডোরার নাগরিক, কারণ অ্যান্ডোরা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য দেশ।'

এই সময়েই চ্যাপলিন কোনো এক পত্রিকায় লিখলেন,—

'Before long, I shall perhaps leave the United States, although it has given me so many moral and material satisfactions. I, Charlie Chaplin, declare that Holywood is dying, Holywood is fighting its last battle and it will lose that battle unless it decides, once and for all, to give up standarizing its films—unless it realises that masterpieces can not be mass-produced in the Cinema, like tractors in a factory,'

চ্যাপলিন যখন এইভাবে রাষ্ট্রীয় দপ্তরে গভীর আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন হঠাৎ তিনি আবার এক বিয়ে করে বসলেন। বিখ্যাত

নাট্যকার ইউজিন ও'নীলের আঠারো বছরের কন্যা উনা ও'নীলকে তিনি বিয়ে করলেন ১৯৪৩ সালের ১৬ জুন।

যুদ্ধ থামল, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি এল না। শোষকের মাথায় গজিয়ে উঠল আর এক যুদ্ধের চক্রান্ত। আর একটা দানবীয় উন্মত্ততার লোভে যুদ্ধবাদীর দল উঠল নেচে। চ্যাপলিনের মনে খটকা লাগল, প্রচণ্ড নাড়া খেল তাঁর বিশ্বাস। তবে কি কোনো উপায়ই নেই? মানুষের মুক্তির কোনো পথই কি নেই? ১৯৪০-এর সেই ছাপোষা নাপিতের স্বপ্ন কি তবে সফল হবে না।

সীমাহীন ঘৃণায় চ্যাপলিনের মন বিষিয়ে উঠল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লেন তিনি। আসামির কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে তীব্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে অভিযোগ করলেন সমাজের এই দানবীয় অব্যবস্থাকে, সভ্যতার এই চরম বিকৃতিকে। ১৯৪৭ সালের MONSIEUR VERDOUX তাঁরই জীবন্ত প্রতিফলন।

বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে চ্যাপলিনকে এবার ভবঘুরের পোশাকটি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হলো। কোনো এক ব্যাংকের সাধারণ কেরানি এই ভের্দু—পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির জন্য এক মজার ব্যবসায়ে নেমেছে সে—মানুষ মারার ব্যবসা। এক এক করে বড়লোকের মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ভের্দু তাদের বিয়ে করে এবং কয়েক দিন যেতে না যেতেই তাদের খুন করে সম্পত্তি নিয়ে পালিয়ে যায়। এমনি করে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে ভের্দু তার পরিবারের নিরাপত্তার একটা সুবন্দোবস্ত করে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ভের্দু দেউলে হয়ে পড়ে, এবং তার কিছু পরে সে তার 'ব্যবসায়িক জীবনে' বারোটি ধনী মহিলাকে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। আসামির কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভের্দু সুযোগ পায় কিছু বলতে, এবং সেই সুযোগে চ্যাপলিন কটাক্ষ করেন যুদ্ধবাদীদের কুৎসিত মনোবৃত্তিকে। অবশ্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় ভের্দু।

চ্যাপলিন কোনো এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন,

Von Clausewitz said that war is the logical extension

of diplomacy; M. Verdoux feels that murder is the logical extension of business—He typifies the psychological disease of derpression. He is frustrated, bitter and pessimistic. But he is never morbid.'

চিত্রপরিচালক অর্সন ওয়ল্সে্স্-এর মূল ভাব অবলম্বনে রচিত MONSIEUR VERDOUX-এর কাহিনীর বিদ্রূপটি রয়েছে এখানেই, অর্থাৎ যেখানে তিনি যুদ্ধকে দেখিয়েছেন ব্যবসারই পরিণতি হিসেবে, যেখানে তিনি ব্যবসাকে দেখেছেন এক সর্বনাশা ব্যবসা হিসেবে। কোনো এক ব্যাংকে সাধারণ কেরানির চাকরি করতে করতে ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক সংকটের মুখে এসে মঁসিয়ে ভের্দু বুঝতে পারল ভালো মতো একটা কিছু পেশা ধরতে না পারলে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। চারদিকের অবস্থা সমঝে দিয়ে সুবিধেমতো একটা ব্যবসা ফেঁদেও ফেলল ভের্দু—মানুষ মারার ব্যবসা। নানা কৌশলে ধনী মহিলাদের বিয়ে করা এবং সুবিধেমতো তাদের খুন করে সম্পত্তি নিয়ে উধাও হওয়া—এই হলো তার ব্যবসা। এই ব্যবসা চালাতে ক্ষমতার দরকার। তার চেয়েও বেশি দরকার সাহসের। ভের্দু এই সমস্ত করে চলল শুধু তার পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির জন্য। সে দেখেছে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পাকে পড়ে সাধারণ মানুষ কেমন করে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে। সে তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণা নিয়ে বুঝেছে, এমন কোনো শক্তি নেই পৃথিবীতে যা এই মৃত্যুর পথ রোধ করতে পারে। অথচ সে তার পঙ্গু স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে মরতে দিতে রাজি নয়, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তাদের বাঁচিয়ে রাখবেই। ভের্দুর এই অমানুষিক ব্যবসার পেছনে যুক্তি এইটুকুই। সভ্যতার এক রকম বিকৃতির মুখে সে তার প্রিয়জনকে আগলে রাখার জন্য এই সর্বনাশা ব্যবসায়ে নেমেছে এবং ভের্দুর মতে, 'Business is a ruthless business.'

এক একটি মহিলাকে বাগে আনতে ভের্দুকে মেহনত করতে হলো প্রচুর। মারি গ্রস্নে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা, যৌবন পেরিয়ে এসেছে বছর পনেরো আগে। ভের্দুর কাছে মহিলাটি এসেছে একটি কাজে—নিতান্তই

বৈষয়িক কাজ। কথায় কথায় মহিলা জানাল, তার স্বামী মারা গেছে কয়েক বছর আগে। সঙ্গে সঙ্গে ভের্দুর মগজে ব্যবসায়িক বুদ্ধি খেলতে লাগল। একটি ঘরে মহিলাকে নিয়ে গিয়ে সে বলল যে এই ঘরেই তার স্ত্রী জীবিত অবস্থায় থাকত। মহিলাটি তখনও বুঝতে পারেনি ভের্দু কী বলতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই যখন ভের্দু বলে উঠল, 'Your eyes are deep pools of desire' তখন তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে লোকটার উদ্দেশ্য সাধু নয়। এই বুড়ো বয়সে নতুন করে নতুন মানুষ নিয়ে ঘর করার ইচ্ছে মহিলাটির একেবারেই নেই। কিন্তু ভের্দু নাছোড়বান্দা, বলল,

'Nonsense! What difference does age make? Yor have ripeness. Luxuriouness, more experience, more character, now—more everything.'

তারপর খপ করে মহিলার হাতখানা চেপে ধরে ভের্দু বলে উঠল, 'This is inevitable.' অবশ্য সে-যাত্রায় কিছুই হলো না।

ভের্দু কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, লেগেই রইল প্রৌঢ়া মহিলার পেছনে। ছবির সমস্তটা জুড়ে সে নানা ফিকির-ফন্দি এঁটে তাকে বাগে আনার চেষ্টা করতে লাগল এবং তারই মধ্যে অন্য একাধিক মহিলার সঙ্গেও ঘটনা ঘটল অনেক।

মুহূর্তের অবসর নেই ভের্দুর। ব্যবসার দরুন তাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে দিনরাত। কখনো কোনো মহিলাকে প্রেম নিবেদন করতে হচ্ছে, কখনো কোনো বিগড়ে-যাওয়া সম্পর্ককে মেরামত করে নিতে হচ্ছে, কখনো বা ব্যাংক 'ফেল' পড়ার আগেই ছুটতে হচ্ছে ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা তুলে আনতে, কখনো নতুন ব্যবসার ঠিকানা খুঁজতে ঢুঁড়ে বেড়াতে হচ্ছে এখানে-ওখানে। অশান্তি আর অস্থিরতা যেন লেগেই রয়েছে তার সঙ্গে।

কিন্তু এমন একটি স্থানও ভের্দুর রয়েছে যেখানে সে ধীরস্থির শান্ত। শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামীণ পরিবেশে সুন্দর এক বাড়িতে সে ফিরে যায় তার পঙ্গু স্ত্রী আর একমাত্র ছেলের কাছে।

ব্যবসার চাপে সময় করে উঠতে না পারলেও প্রতিবছর বিয়ের দিনটাতে ভের্দু তার স্ত্রীর পাশে থাকবেই। ছবিতে দেখা গেল, হঠাৎ একদিন সে এসে দাঁড়াল বাড়ির দরজায়। স্ত্রী তো তাকে দেখে অবাক, এমন সময়ে সে এল কেমন করে! ভের্দু বলল, 'Those ten wonderful years!' অর্থাৎ বিয়ের দশটা বছর পেরিয়ে গেল সেদিন।

ভের্দু তার স্ত্রীকে বলল, জীবন ধারণের জন্য তাকে খাটতে হচ্ছে অমানুষিক খাটুনি। শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। অথচ এছাড়া উপায় নেই। ভের্দু বলল,—

'These are desperate days. Millions are starving and unemployed. It is not easy for a man of my age.'

ভের্দুর ছেলে একটা বেড়ালের লেজ ধরে টানছিল। ভের্দু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

'There is a cruel streak in you. I wonder where you got it—violence begets violence, remember.'

নতুন এক ধরনের বিষের সন্ধান পেল ভের্দু। সেই বিষ প্রয়োগের পর নাকি মৃত লোকের শরীরের কোথাও বিষের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিষয়টি কতখানি কার্যকরি তা পরীক্ষা করার জন্য ভের্দু বৃষ্টির মধ্যে রাস্তা থেকে একটি গরিব মেয়েকে ধরে নিয়ে এল। সরল বিশ্বাসে মেয়েটি তার সঙ্গে এল। মেয়েটি শীতে কাঁপছে। ভের্দু তার জন্য টেবিলে খাবার সাজাতে লাগল। ভালোমানুষ মনে করে মেয়েটি ভের্দুকে তার নিজের কথা বলতে লাগল। যুদ্ধ থেকে পঙ্গু হয়ে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই তার স্বামী মারা যায় এবং সেই থেকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। ভের্দু মদে বিষ ঢালতে ঢালতে বলল যে, পৃথিবীতে স্থায়ী কিছুই নয়—দুঃখও নয়।

নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও কিন্তু মেয়েটি ভেঙে পড়েনি। মৃত স্বামীর ভালোবাসা, তার আদর্শ, বিশ্বাস বুকে করে জীবনের সমস্ত লাঞ্ছনাকে সে সহ্য করেছে—করবেও। মেয়েটির এই কথার জবাবে ভের্দু একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল, কয়েকটা কথাও বলেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

রুখে উঠেছিল মেয়েটি, গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠল, 'How little you know about women।' ভের্দুর ভেতরটা হয়তো সেই মুহূর্তে একটা দারুণ নাড়া খেয়েছিল, সভ্যতার চরম বিকৃতির মাঝে নাম-গোত্রহীন এক 'মামুলি' মেয়ের এই কথাটুকু হয়তো ভের্দুর কাছে এক প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। বিষ-মেশানো মদের পাত্রটা ভের্দু মেয়েটির সামনে থেকে সরিয়ে নিল। অতি সাধারণ এক মেয়ের কাছে চরম পরাজয় মেনে নিয়ে নিজের মনেই হেসে উঠল ভের্দু,—বলল, Your philosophy may corrupt me.'

আরো অনেক ঘটনা ঘটল এবং তার পরেই এলো ইউরোপের রাজনৈতিক জীবনে এক প্রচণ্ড আলোড়ন। হিটলার আর মুসোলিনির দাপটে সারা তল্লাট উঠল কেঁপে, স্পেনের জীবনযাত্রা উঠল বিষিয়ে, যুদ্ধের আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ল।

এক হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ভের্দু। এই ক'বছর লোকটা যেন আরো অনেক বুড়িয়ে গেছে। স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে সম্পূর্ণ দেউলে হয়ে সে আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে, জীবনকে আঁকড়ে ধরার মতো কিছুই তার আর রইল না। কোনোমতে জীবনটাকে টেনে হেঁচড়ে বয়ে নেওয়া মাত্র। নিরুদ্বিগ্ন ভের্দু, দেউলে ভের্দু, নিঃস্ব ভের্দু!

রাস্তায় হঠাৎ ভের্দুর সঙ্গে দেখা হলো সেই মেয়েটির যাকে সে মারতে গিয়েও মারেনি। গাড়ি থেকে মেয়েটি ভের্দুকে ডাকল। ভের্দু দেখল, মেয়েটির জীবনে একটা মস্ত পরিবর্তন এসেছে—চারদিকের এই ওলোটপালটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া হয়তো তার আর কোনো উপায় ছিল না। মেয়েটির কপাল ফিরেছে, সে এখন এক গোলা-বারুদের কারখানার মালিকের রক্ষিতা। শুনে ভের্দু একটু মুচকি হাসল, বলল, 'এই ব্যবসাটাই আমার করা উচিত ছিল। ওটা এখন জমবে ভালো।'

মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ভের্দু বলল,

'I am going to meet my destiny.'

এর পরেই ভের্দু ধরা পড়ল। ভের্দুর বিরুদ্ধে বারোটি সম্ভ্রান্ত মহিলা খুন করার অভিযোগ দাঁড় করানো হলো। আইন ও শৃঙ্খলার জন্য, সমাজের নিরাপত্তার জন্য ভের্দুর মতো 'Masskiller'-কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার দাবি জানানো হলো সরকারপক্ষ থেকে। কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভের্দু কোনো প্রতিবাদ করল না। শুধু বলল, 'Mass-killing-does not the world encourage it?—I am an amateur in comparison.'

ভের্দু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলো। আদালত থেকে যখন তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন সে শুধু বলল,

'I shall see you all soon—very soon !

জেলখানার ছোট কুঠরিতে শুয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ভের্দু, জানাল,

'Wars, conflict—it is all business. One murder makes a villain millions a hero, numbers sanctify.'

ধর্মযাজক, সাংবাদিক প্রভৃতি নানা লোক নানা প্রশ্ন করল ভের্দুকে। শ্লেষ্মাত্মক ভঙ্গিতে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পর যখন সে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করবার জন্য উঠেছে সেই মুহূর্তে একটি লোক একমাত্র 'রাম' (মদ) নিয়ে এসে হাজির হলো। প্রথমে ভের্দু লোকটিকে ফিরিয়ে দিল, এবং পরমুহূর্তেই পাত্রটির দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল,

'just a minute, I have never tasted rum.'

পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে ভের্দু চলল বধ্যভূমির দিকে।

অনেকে হয়তো বলবেন—MONSIEUR VERDOUX- তে চ্যাপলিনের একটি সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র সৃষ্টি করলেন, তাঁর ভের্দুর সঙ্গে এতদিনের পরিচিত খুদে ভবঘুরেটির কোনো মিলই নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে ভের্দু আর কেউই নয়, সেই অতি পরিচিত খুদে ভবঘুরেরই logical extension. এতদিন ধরে ভবঘুরে চার্লি বেঁচে থাকার জন্য—সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য—বড়লোকদের অনুকরণ করে এসেছে। বড়লোকদের অনুকরণে কখনো সিগারেট ফুঁকছে, কখনো ওই ঢঙে সম্ভ্রান্ত মহিলাকে প্রেম নিবেদন

করেছে, কখনো বা আশপাশের লোকদের সঙ্গে কথা বলেছে মস্ত ভারিক্কি চালে। এই সমস্ত করতে গিয়ে চার্লি একদিকে নিজেও যেমন হাস্যস্পদ হয়ে উঠেছে, অন্য দিকে বড়লোকদের ভারী ভারী মূল্যবোধগুলোকেও হাস্যকর করে তুলেছে। তারপর, বহু পথ অতিক্রম করে ভবঘুরে চার্লি এসে দাঁড়িয়েছে আজকের দিনে—সভ্যতার এক নিদারুণ বিপর্যয়ের মুখে। চার্লি বুঝল, জীবনধারণটাই এখন হয়ে উঠেছে দুঃসহ। অথচ তাকে বাঁচতেই হবে, তার প্রিয়জনকে বাঁচাতেই হবে। পারিপার্শ্বিকতা এখন এমন ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে বিশেষ কোনো বড়লোককে অনুকরণ করে বেঁচে থাকা বা কাউকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ব্যক্তিকে ছেড়ে তাই সে এবার ধরল শ্রেণিকে,—বিশেষ কোনো বড়লোককে ছেড়ে ধরল যুদ্ধবাজের দলকে। পুরোনো পরিচ্ছদ ছেড়ে নতুন পোশাক সে পরল, চার্লি না হয়ে হলো ভের্দু। যুদ্ধবাদীর অনুকরণে এক ছোটখাটো ব্যবসা ফেঁদে বসল সে—মানুষ মারার ব্যবসা। সেই amateurish ব্যবসা করতে গিয়ে ওই মানুষ মারার ব্যাপারটিকে রীতিমতো হাস্যকর বস্তু হিসেবে দাঁড় করাতেও সে কিন্তু ভুলল না। হত্যার মতো একটি বীভৎস ব্যাপারকেও এইভাবে কমিক করে তোলা নিঃসন্দেহে চার্লি চ্যাপলিনের বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় দেয়। এরপর ছবির শেষভাগে প্রশ্নোত্তরের সময় মনে হলো যেন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য চ্যাপলিনের সেই চির-পরিচিত খুদে ভবঘুরেটি ক্ষেপে উঠল ওপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায়, এবং পরক্ষণেই অতি সহজভাবে বীরের মতো বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে এই সব ঘৃণিত জানোয়ারের নাকের ডগায় তুড়ি মেরে এগিয়ে চলল বধ্যভূমির উদ্দেশে। তফাতটা শুধু প্রকাশভঙ্গিতে—চেতনার বিভিন্ন স্তরে যা বদলাতে বাধ্য। তাই ভবঘুরের সেই দার্শনিক বৈরাগ্যের চালে ঘাড় দোলানো না দেখে এবার দর্শক শুনল ছোট একটা কথা,—

'Just a minute, I have never tasted rum.

১৯৪৭ সালের ১১ এপ্রিল MONSIEUR VERDOUX প্রথম দেখানো হলো নিউইয়র্কের ছবিঘরে। কিন্তু ছবিটি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে

প্রতিক্রিয়াশীল মহল থেকে নতুন উদ্যমে আবার প্রচার চলল—শুধু MONSIEUR VERDOUX-এর বিরুদ্ধেই নয়, চ্যাপলিনের বিরুদ্ধেও। খোলাখুলিভাবে যে-সমস্ত দল এই নোংরা প্রচারে অগ্রণী হলো সেই দলগুলোর মধ্যে CATHOLIC WAR VETERANS বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধুরন্ধর সাংবাদিক ওয়েস্টব্রুক পেগলার কুৎসিৎ ভাষায় চ্যাপলিনকে আক্রমণ করলেন এবং MONSIEUR VERDOUX বেরোবার কয়েক মাস পরে সুরকার হ্যানস আইসলারের বহিষ্কার প্রসঙ্গে চ্যাপলিন সম্পর্কে লিখলেন,

'This was an attempt by an alien, resident here for more than thirty-five years, guilty of a degree of moral turpitude which disqualifies him form citizenship, caught in the act of cheating the government of an enormous debt for taxes, a slacker in both world wars, although he clatmoured with the Communists for a second front in the latest one.'

তার ওপর প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিক দল প্রশ্নবাণে চ্যাপলিনকে উদ্ব্যাস্ত করে তুলল। একজন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কমিউনিস্ট?' জবাবে চ্যাপলিন বললেন, 'না।' আর একজন প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি আপনি কমিউনিস্টদরদি?' জবাব এল,

'During the war I was sympathetic with the Russians who were holding the front. I believe we owe them thanks and in that sense I was sympathetic.'

এইভাবে এবং আরো নানাভাবে চ্যাপলিনকে ঘায়েল করার জঘন্য চেষ্টা চলতে লাগল এবং এই চক্রান্তে সরকারপক্ষ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন যোগাল। ফল দাঁড়াল এই যে, আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় MONSIEUR VERDOUX- এর প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেল। আমেরিকার বাইরেও চ্যাপলিনের শত্রুসংখ্যা কিছু কিছু বাড়ল এবং নানা নিকৃষ্ট উপায়ে তাঁর ছবি নিষিদ্ধ করার জন্য শত্রুপক্ষের উসকানিও বেড়ে গেল শতগুণ। ভবঘুরে চার্লি সম্পর্কে চ্যাপলিনের ভবিষ্যৎ বাণী আর

একবারের মতো প্রমাণিত হলো,

'People who have liked him vaguely will have to make up their minds.'

দশ

১৯৫২ সাল। MONSIEUR VERDOUX বেরোবার পরে পাঁচ বছর গড়িয়ে গেল এবং এই কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এক চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করল। গোটা পৃথিবী বিভক্ত হল দুইটি শিবিরে। একটি শান্তির, আর একটি যুদ্ধের। একদিকে অ্যাটম বোমার হুমকিতে পৃথিবীর সমস্ত ঐতিহ্যকে, সমস্ত সভ্যতাকে উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলল, আর একদিকে চলল পৃথিবীর সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জড়ো করে শান্তি প্রাচুর্যের পরিবেশ রচনা করার এক দুরন্ত সঙ্কল্প। চার্লি চ্যাপলিনের নবতম শিল্প-কীর্তি LIMELIGHT-এর আবির্ভাব এই সময়েই।

চ্যাপলিন জানালেন,

'In these days of hate and suspicion I have tried to tell something about human kindness.'

এক মিউজিক-হল কমেডিয়ানকে কেন্দ্র করে কাহিনীটি গড়ে উঠল। শেষজীবনে হয়তো তার শিল্পসৃষ্টি অসার্থক হয়ে পড়বে এই ভয়ে সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে বসেছে প্রৌঢ় কমেডিয়ান, এমনি সময়ে এক নবাগতা শিক্ষানবিশের সংস্পর্শে এসে নতুন উদ্যমে সে পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরল। জীবনে পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে মেয়েটি যখন আত্মহত্যার চেষ্টা করছে ঠিক সেই মুহূর্তে এল প্রৌঢ় কমেডিয়ান। মেয়েটিকে সে অনেক বোঝাল, বলল—চেতনা মানুষকে মহীয়ান করে তুলেছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে মানুষের চেতনা, আত্মহত্যা হলো সেই চেতনারই কুৎসিত অপচয়।

একটি বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল দুজনের জীবনে, পৃথিবীকে তারা আঁকড়ে ধরল দেহের সমস্ত উত্তাপ আর ভালোবাসা দিয়ে। কাহিনীর শেষে প্রৌঢ় কমেডিয়ান মঞ্চে ফিরে এল, সার্থক হয়ে উঠল তার

শিল্পসৃষ্টি। কিন্তু মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না—মঞ্চের আড়ালেই তার মৃত্যু ঘটল। মঞ্চে তখনো মেয়েটি নেচেই চলেছে।

মেয়েটি যে নেচেই চলল শুধু তাই নয়, কথাটা আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল প্রৌঢ় কমেডিয়ান। সে জানাল যে তাকে আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, কিন্তু যাওয়ার আগে পৃথিবীকে সে দিয়ে গেল তার অর্জিত অভিজ্ঞতা—তার মৃত্যুর পরেও পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে তার বিশ্বাস—যে বিশ্বাসকে সে কিনেছে জীবনের দামে।

এ শুধু কাহিনীর প্রৌঢ় কমেডিয়ান ক্যালভেরোর বিশ্বাস নয়, এ বিশ্বাস চার্লি চ্যাপলিনেরও। এবং এই বোধটিকে, এই বিশ্বাসকে থেঁতলে গুঁড়িয়ে দিতে চায় আজকের মারণ-যজ্ঞের পুরোহিত দল। তাই দেখা গেল, LIMELIGHT উদ্বোধন করতে চ্যাপলিন যখন ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের পথে রওনা হলেন, তখন সুযোগ বুঝে আমেরিকার সরকারি দপ্তরের ধুরন্ধর উকিল অ্যাটর্নি জেনারেল ম্যাকগ্র্যানারি হুমকি দিলেন—চার্লি চ্যাপলিনকে আমেরিকায় ফিরে আসতে দেওয়া হবে কি না, সে কথা তাঁদের এখন ভাবতে হবে। চ্যাপলিনের বে-আইনি করার এই কাপুরুষোচিত ঘৃণ্য চক্রান্তে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী রুখে উঠল, প্রতিবাদের ঝড় এল চারদিক থেকে। তারই মাঝে অচঞ্চল বিশ্বাস নিয়ে চ্যাপলিন লন্ডনে দাঁড়িয়ে বললেন,

'I have not come here to become an international crisis.'

প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে ভড়কে গিয়ে প্রায় সাত মাস পরে মার্কিন সরকার চ্যাপলিনকে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার ছাড়পত্র পাঠিয়ে দিল। চ্যাপলিন তখন সুইজারল্যান্ডে। তিনি সেই ছাড়পত্র নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলেন জেনেভাস্থিত আমেরিকান দূতাবাসে, কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে বললেন যে তাঁর আর ওসবের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ চিরকালের মতো তিনি আমেরিকাকে নির্বাসন দিলেন—যে আমেরিকায় রয়েছেন তাঁর অসংখ্য বন্ধু আর মুষ্টিমেয় শত্রু।

এমনি করেই আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়ালেন দুনিয়ার পশুশক্তির বিরুদ্ধে, সভ্যতার চরম বিকৃতির মধ্যে দেখা দিলেন এক দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ হয়ে।

এই দিন আবার একদিন নাকচ হবে—আসবে নতুন দিন। এক চূড়ান্ত পরিবর্তন হবে পৃথিবীর, যেখানে সাধারণ মানুষের ব্যর্থতা আর হতাশা থাকবে না, যেখানে নবজীবনের কোলাহল আকাশ-বাতাস মথিত করে তুলবে।

আজ সেই আগামী যুগের প্রস্তুতির দরুন তোলপাড়ের মধ্যে সিনেমার দর্শক তাকিয়ে রয়েছে চার্লি চ্যাপলিনের দিকে—নতুন আশা নিয়ে, নতুন দাবি নিয়ে। এই দাবি শুধু সিনেমার দর্শকেরই নয়, এই দাবি তাঁর নিজেরও—নিজের কাছে। LIMELIGHT-এর প্রৌঢ়া কমেডিয়ানের উক্তিই চার্লি চ্যাপলিনের ভবিষ্যৎ শিল্প পথের নির্দেশ দিচ্ছে—I MUST GO ON, THAT IS PROGRESS.

ইউরোপে ফিরে এসে চ্যাপলিন ছবি তৈরি করলেন তিনটি। ১৯৫২ সালে LIMELIGHT, ১৯৫৭ সালে A KING IN NEW YORK এবং শেষ ছবি ১৯৬৬ সালের, নাম A COUNTESS FROM HONG KONG, যে ছবিতে চ্যাপলিন একটি অতি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করলেন এবং মুখ্য ভূমিকায় করলেন সোফিয়া লোরেন ও মার্লোন ব্র্যান্ডো।

LIME LIGHT নিয়ে পৃথিবীর নানা পত্র-পত্রিকায় নানারকম লেখা হলো। প্রচুর উচ্ছ্বাস করলেন বিদগ্ধজনেরা, বৃদ্ধ ক্যালভেরোর চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেলেন চ্যাপলিনের সমগ্র শিল্পসত্তা এবং কেউ কেউ এমনও মনে করলেন এরপর হয়তো চ্যাপলিন ছবির রাজ্য থেকে পুরোপুরি বিদায় নেবেন।

LIME LIGHT অবশ্যই চ্যাপলিনের অন্যান্য ছবির মতো নয়—না বিষয়বস্তুতে, না তার গঠনপদ্ধতিতে। এবং MONSIEUR VERDOUX থেকে অনেক তফাত। গল্পের কাঠামো এখানে

রীতিমতো মামুলি, চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি টানার জন্য দেখা গেল এক ধরনের চ্যাপলিন-বিরুদ্ধ ব্যগ্রতা এবং সব মিলিয়ে গোটা ছবিটা ছড়িয়ে রইল সেন্টিমেন্টের বাড়তি প্রকাশ। অর্থাৎ অহেতুক সেন্টিমেন্টাল। এ কথা সত্যি চ্যাপলিন তাঁর বহু ছবিতেই এমন সমস্ত ঘটনা আমদানি করেছেন প্রচুর, যা অন্য পরিচালকের হাতে পড়লে অর্থহীন সেন্টিমেন্টাল আবর্জনাতে পর্যবসিত হতো। কিন্তু চ্যাপলিন সে-সমস্ত ঘটনাকে ব্যবহার করেছেন প্রয়োজনে, তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে সেগুলোকে ঘুরিয়ে ফাঁপিয়ে ছবিতে সাজিয়েছেন, শারীরিক দৃশ্যকে ছাপিয়ে ভাবনার জগৎকে প্রসারিত করেছেন, স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে—গুরু গম্ভীর দার্শনিক চালে নয়—বিদ্রূপ করেছেন অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি ডাকসাইটে শ্রেণিকে এবং ভালোবেসেছেন অসংখ্য মানুষকে। ওই সমস্ত আপাত সেন্টিমেন্টাল ঘটনা নিয়ে চ্যাপলিন তাঁর সমস্ত ছবিতেই, আটপৌরে ভাষায় যাকে 'ফিচলেমি' বলে থাকি, তাই তিনি করেছেন। এবং তাই করে তিনি পৃথিবীকে চমকে দিয়েছেন, অসামান্যতা অর্জন করেছেন, ইংরেজি ভাষায় একটি নতুন শব্দের আমদানি করেছেন : Chaplinesque. মিউজিক হলো কমেডিতে যাঁর হাতে খড়ি, সেই চ্যাপলিন LIME LIGHT-এ এক কমেডিয়ানকেই এনে দাঁড় করালেন—বৃদ্ধ, ব্যর্থ, অনাদৃত। জীর্ণ মহিমাকেই সম্বল করে কমেডিয়ানবেশী অভিনেতা চ্যাপলিন সমস্ত ছবিতে ছড়িয়ে রইলেন, কিন্তু পরিচালক চ্যাপলিন চরিত্রটির সঙ্গে কেমন যেন জড়িয়ে গেলেন বড্ড বেশি। ফলে, আগেকার ছবিগুলোতে যা ছিল—অর্থাৎ বিন্যাসের তীক্ষ্মতা, বিদ্রূপের তীব্রতা ও Chaplinesque nonsense—তা যেন অনেকটা স্তিমিত মনে হলো এই ছবিতে। যা দাঁড়াল তা এক অভিনয় সমৃদ্ধ এক ট্র্যাজিক উপাখ্যান, সে উপাখ্যানের নায়কের জন্যে বুক ঠেলে কান্না আসে এবং যার শেষে দর্শক যেন শুনতে পান : আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো। এক ট্রাডিশনালিস্ট–এর দক্ষ ছবি; তার বেশি নয়।

A KING IN NEW YORK নিয়ে চ্যাপলিনকে নানা ঝামেলায়

পড়তে হলো। বিরূপ সমালোচনা হলো প্রচুর। আজীবন যাঁরা চ্যাপলিনের প্রচণ্ড ভক্ত তাঁরাও বেশ বিব্রত বোধ করলেন। অনেকে এমন কথাও বললেন যে ছবিটা না দেখলেই হতো ভালো। মোটামুটি ছবিটি ব্যর্থ হিসেবেই চিহ্নিত হলো :

চ্যাপলিন অবশ্য ভীষণ চটে গেলেন, তীব্র ভাষায় গালাগালি দিলেন অনেককে।

A COUNTESS FROM HONG KONG- এও চ্যাপলিনের সেই স্বভাবসুলভ আমেজ পাওয়া গেল না। চ্যাপলিনও শেষ পর্যন্ত এই ছবি নিয়ে বিশেষ তেমন হইচই করলেন না।

সবাই ভাবলেন, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই চার্লি চ্যাপলিনের এবার অবসর নেওয়া প্রয়োজন।

চ্যাপলিন সেই থেকে স্ত্রী-কন্যাসহ সুইজারল্যান্ডে বসবাস করছিলেন।

পরিশিষ্ট

(ক)

১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে মৃণাল সেন ভেনিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যান। সেখানে মূল উৎসবের বাইরে চার্লি চ্যাপলিনের সমগ্র ছবির একটা মেলা বসে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ছবি দেখানো হয়। ভেনিস থেকে ফিরে এসে মৃণাল সেন তাঁর ভেনিস অভিজ্ঞতার কথা লেখেন কলকাতার Frontier পত্রিকায়। বহুদিন পরে একসঙ্গে, দুই সপ্তাহে, সমস্ত ছবি দেখার একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলেই সেই রচনার একটি অংশ পুনর্মুদ্রিত হলো।

Venice Film Festival
Mrinal Sen

At Lido, at the official festival in Venice. there were too many films this year, good-bad-indifferent lot, all accommodated in more than half-a-dozen sections. But the most fabulous was the Chaplin session. At the closing ceremony, after the rituals were over and the `selection awards' given to the participants, quietly appeared on the stage a man. 84 years old. who perhaps because of his age, did neither talk nor listen but only felt how intensely the people of the world love him. The man was Charlie Chaplin, almost seized with infirmity. The men of the world at St. Marco's famous opera house La Fenice, went wild. It was like offering homage to a living memorial. For five minutes we lived in ecstasy. As the curtain fell after five minutes Chaplin dropped into a chair, all exhausted.

For two weeks I saw Chaplin, the inimitable `little tramp'. I saw him walkung into an unending journey embracing a large

variety of funny adventures, always buffeted by life, but in the process, Preserving small treasures of life such as human compassion and then walking out towards a glowing horizon. The spirit of the tramp had remained ever-undaunted as I watched him during an unceasing two week session. I laughed and thought and grew.

In 1940 the tramp in the shape of a jew barbar confronted the 'double' called Dictator Hynkel. Here, in the film, with all the reverence of a renewed experience I could see in Chaplin the glorious image of a brilliant propagandist championing the cause of human sanity and telling a naive story between the two wars `when I humanity was kicked about and liberty torn asunder."

"Democracy stinks! shouts Hynkel."

"Liberty stinks!" he adds.

"Freedom of speech stinks !" he reiterates.

With all these lofty ideas the great dictator Hynkel difies all conceivable human logic and assures his aides and amirers that liberty shall hence forth be meant only for the `worthy'. The unworthy appears on the scense—the extension of the tramp—who, having indulged, as usual, in Chaplinesque 'nonsense' turns desperate. In violent desperation the barbar now makes a speech, a full-throated speech the like of which Chaplin had not done before. It is a non-stop speech for five minutes, uncinematic, according to minority fashionable but to me and to most of us one of the most memorable sequences that the art of the cinema can ever offer to the civilised world. As I watched this film, in the midst of hate. suspicion and greed ragging in world politics, I found in the five-minute-long speech a glowing testament of the persecuted who will soon turn militant.

In 1947, after the war was over but when neo-savagery was let loose, Chaplin made his greatest film Monsieur Verdoux. The story dates back to the years of depression but it

sharply reflects the post- war politics manifesting itself on international issues. It is no wonder, therefore, that the State Department at Washington got terribly annoyed with Chaplin. It is a wonder, therefore, that a minority group of enlightened aesthetes found Chaplin to be dimming. The film is macabre, it is sad and bitter and it is most trenchant in its attack.

The last three of his films are not certainly the ones I could be enthusiastic about. Limelight has, of course some tragic power at places. But in its totality and in his `A King in New York' (1957) and 'A Countess form Hong Kong' (1966). I did not find much that could be spoken of in glowing terms.

A Stupendous Journey.

And, on the whole, after two week's continuous run of Tutto Chaplin (The whole of Chaplin) – from making a living and Kid Auto Races at Venice made in 1914 up to A Countess form Hong Kong made in 1966, I feel I have discovered in Chaplin a stupendous journey, a journey through terrible decades, through social injustice and political treachery, a journey in search of peace and happiness. What I found most striking is that here, in him, I see a man who, even without undergoing any organised political schooling, responded splendidly to his own time. As is quite evident in his films, such response has always been immediate and spontaneous. In 1918, in Shoulder Arms, an unnamed soldier arrests the Kaiser amidst a lot of laughter and birngs the captive to the allied camp. Instantly apperars on the screen a line: 'And peace to the world.' From such studied naivete Chaplin attains Shavian heights when. In a more complex world the condemned Monsieur Verdoux charged with 12 killings, says; "One murder makes a villain, millions a hero. Numbers sanctify."

Chaplin, as I watched him for two continuous weeks, is undoubtedly one of the greatest wonders of this century and a living inspiration to all who consider all arts as social entities.

But an eminent British critic told me that he had found in Chaplin a certain meanness.

I looked at the critic. I made sure that he was not joking.

(খ)

১৯৩৭ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যায়। ছোট-বড় বুদ্ধিজীবীরা ছুটে চলে আসেন স্পেনে, International Brigade-এ নাম লেখান। ফ্রাংকোর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেন, এবং অনেকেই সে যুদ্ধে প্রাণ হারান। কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, শিল্পীরা সেই মহান লড়াইয়ে চার্লি চ্যাপলিন প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও তাঁদের খুব কাছাকাছি ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি এক গল্প লেখেন, প্রকাশিত হয় ফরাসি ভাষায় প্রথমে, পরে ইংরেজিতে এবং হয়তো অন্যান্য ভাষায়। স্পেনের যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা চ্যাপলিনের সেই অসাধারণ যুদ্ধবিরোধী গল্পটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো :

RHYTHM

(The story of men in macabre movement)

যন্ত্র-ছন্দ

স্পেনের এক জেলখানা। জেলখানার পেছনে এক অপরিসর উঠোন, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বধ্যভূমি।

সেই উঠোনে দাঁড়িয়ে তরুণ এক লয়ালিস্ট। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছয়জন সৈনিক, ফায়ারিং স্কোয়াড। পাশে স্কোয়াড লিডার অর্থাৎ অফিসার ইন-কমান্ড। একটু তফাতে আরও জনকয়েক অফিসার শেষ দৃশ্য দেখার জন্যে উন্মুখ। মৃত্যুর মতো স্তব্ধ এক পরিবেশ। তারই মধ্যে আসল পদক্ষেপে অতি ধীরে এগিয়ে আসছে দিন। ভোর হচ্ছে।

মনে হয়েছিল হয়তো শেষ পর্যন্ত অন্য রকম কিছু ঘটবে, মৃত্যুদণ্ড হয়তো ওপরের মহল থেকে শেষ মুহূর্তে নাকচ হয়ে যাবে। হোক না

বিরুদ্ধবাদী, লয়ালিস্ট, কিন্তু মানুষটি তো যেমন-তেমন নয়! মস্ত মানুষ, সবাই এক ডাকে চেনে, হাসির গল্প লিখিয়ে হিসেবে তার জুড়ি মেলা ভার। তার ওপর, আজকের এই স্কোয়াড লিডার অর্থাৎ অফিসারের পুরোনো বন্ধু। একসঙ্গে বড় হয়েছে দুজনে, একই সঙ্গে পড়েছে, ঘুরেছে, বেড়িয়েছে, আড্ডা দিয়েছে। তর্ক-বিতর্ক ঝগড়া কত কী-ই না করেছে দিনের পর দিন। মতান্তর হয়েছে, মনান্তর ঘটেছে দেশের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। সেই রাজনীতি আজ দেখা দিয়েছে এক ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে, গৃহযুদ্ধের বেশে।

আজ দুজন দুজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। জেলখানার পেছনে উঁচু পাঁচিল ঘেরা উঠোন! বধ্যভূমিতে।

পুরোনো অনেক কথাই মনে পড়েছে অফিসারের। কিন্তু, সত্যিই, কী লাভ সেসব কথা ভেবে? যুক্তিতর্কের কোনো প্রয়োজন আর নেই। যুদ্ধের দাপটে আজ ওসব বাতিল হয়ে যাচ্ছে। অতীত আজ বাতিল, বন্ধুত্ব খারিজ, শুধু চোখের সামনে ভবিষ্যৎ—যার কথা ভেবে দেশের মানুষ আজ এক অন্তর্ঘাতী যুদ্ধে মেতে উঠেছে।

কতদিন পরে দুই বন্ধু আজ মুখোমুখি হলো। আজকের এই ভয়ঙ্কর সকালে। দুজন দুজনের চোখে চোখ রাখল, মৃদু হাসল দুজনে, কোনো কথা বলল না। সব চুপচাপ, শুধু ভোরে হালকা আলো ধীরে ধীরে ছড়াতে লাগল পাঁচিল ঘেরা উঠোনটায়। কেমন এক শীতল স্তব্ধতা। হয়তো বা এক বেয়াড়া প্রশান্তি এক কঠিন ছন্দে বাঁধা। নৈঃশব্দের ছন্দ, বুকের ধুকধুকির মতো। সে ছন্দের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে উপস্থিত প্রতিটি মানুষ—ফায়ারিং স্কোয়াড, স্কোয়াড লিডার—সবাই।

নৈঃশব্দ ভেদ করে হঠাৎ গর্জে উঠল স্কোয়াড লিডারের কণ্ঠস্বর : Attention! ছয়টা রাইফেল নড়ে উঠল। ছয়টা রাইফেল শক্ত হাতে চেপে ধরল ছয়জন সৈনিক। শক্ত কঠিন ছয়জন! ছন্দে বাঁধা ফায়ারিং স্কোয়াড।

বিদ্যুতের বেগে কী যেন ঘটে গেল। লয়ালিস্ট তরুণটি একটু কেশে উঠল, গলাটা শেষবারের মতো পরিষ্কার করে নিল।

অর্থাৎ সমস্ত তাল গেল কেটে, বেসুরো ঠেকল সমস্ত পরিবেশ। নৈঃশব্দের ছন্দ ভেঙে খান খান হয়ে গেল। যেন ছিটকে পড়ল স্কোয়াড লিডার, দিশেহারা, শূন্যে ভাসমান তাড়াতাড়ি কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইল। আসামির দিকে তাকাল। যদি সে কিছু বলে।

আসামি অর্থাৎ তরুণ লয়ারিলস্ট স্থির দাঁড়িয়ে। চোখে কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো জিজ্ঞাসা নেই মুখে।

ফায়ারিং স্কোয়াড? স্কোয়াডের দিকে তাকাল লিডার।

বন্দুকধারী ছয়জন সৈনিক। কঠিন ছন্দে বাঁধা ছয়জন। দ্বিতীয় আদেশের প্রত্যাশায় আজ্ঞাবহ ছয়জন।

কয়েকটা মুহূর্তের জন্য 'চৈতন্য' হারিয়ে ফেলল স্কোয়াড লিডার। শুধু চোখের দেখাকে সম্বল করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। দেখল : একটা মানুষ দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছয়জন সৈনিক, একটু তফাতে আরও জনকয়েক।

অর্থাৎ ভীষণ এক আনাড়ি দৃশ্য, কোনো অর্থ নেই, কোনো তাৎপর্য নেই। যেন অনাদি কাল থেকে একটা ঘড়ি অবিরাম চলে আসছিল, হঠাৎ যেন ধুকধুকিটা বন্ধ হয়ে গেল।

এমনি করে কয়েকটা অসাড় মুহূর্ত কাটল। তারপর 'চৈতন্য' ফিরে এল ধীরে ধীরে। স্কোয়াড লিডার বুঝতে পারল, এক্ষুনি কী যেন সে বলেছে, আরও কী কী যেন বলবার রয়েছে। নড়েচড়ে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করল লিডার, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বেশ চেঁচিয়েই বলে উঠল : Shoulder Arms !

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন ঠিক হলো না, কেমন যেন ঠেকল নিজের কানেই। অসংলগ্ন, বেসুরো, বেতালা।

কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে এই কথা তারা অতশত বুঝল না, কোনো কিছুর ধার ধারল না। যা করণীয় তা-ই তারা করে বসল চটপট। করল স্বাভাবিক বিক্রমে, কাঁধ বরাবর বাগিয়ে তুলল ছয়টা বন্দুক।

সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামিক হলো স্কোয়াড লিডার। বিপুল বিক্রমে হেঁকে উঠল : To aim !

ছয়জন সৈনিক প্রস্তুত। ট্রিগারে আঙুল পড়ল ছয়জনের। শেষ আদেশের প্রত্যাশায় মুখর সমস্ত পরিবেশ।

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকটা পায়ের শব্দ শোনা গেল দ্রুত। কারা যেন দৌড়ে আসছে।

তবে কি মৃত্যুদণ্ড মকুব হলো? ওপর থেকে খবর এল শেষ পর্যন্ত?

???

অসহ্য অস্থিরতায় চিৎকার করে উঠল স্কোয়াড লিডার : Stop !

ছয়জন সৈনিক বন্দুক বাগিয়ে প্রস্তুত।

ছয়জন সৈনিক এক যান্ত্রিক ছন্দে আবদ্ধ।

ছয়জন সৈনিকের ছয়টা বন্দুক স্কোয়াড লিডারের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল : গুরুম ! ! !

(গ)

চার্লি চাপলিনের ছবির একটি পূর্ণ তালিকা :

1914

Making A Living Kid, Auto Races At Venice, Mabel's Strange Predicament, Between Showers, A Film, Johnnie Tangy Tangles, His Favourite Pastime, Cruel, Cruel Love, The Star Boarder, Mabel At The Wheel, Twenty Minutes of Love, Caught In A Gabaret, Caught In The Rain. A Busy Day, Mabel's Married Life, Laughing Gas, The Property Man, The Face on the Barroom Floor, The Masquer- ader, His New Profession, The Rounders, The New Janitor, Those Love Pangs. Dough And Dynamite, Gentlemen of Nerve, His Musical Career, Tillie's Punctured Romance, Getting Acquainted, His Prehistoric Past,

1915

His New Job, A Night Out, The Champion, In The Park, Ajiteny Elopement, The Tramp. By The Sea, Work, A Woman,

The Bank, Shanghaied, A Night In The Snow,

1916

Charlie Chaplin's Burlesque On Carmen, Police, The Floor Walker, The Fireman, The Vagabond, One A. M, The Count, The Pawnshop, Behind The Screen, The Rink,

1917

Easy Street,The Cure, The Immigrant, The Adventurer,

1918

A Dog's Life. His Trysting Place, Sholder Arms, The Kid (1921) The Idle Class (1921). The Pilgrim (1923)

The Gold Rush (1921). The Circus (1928). City Lights (1931). Modern Times (1936). The Great Dictator (1940). Monsieur Verdoux (1947). Limelihgt (1952) A King in New York (1957). A Countess From Hong Kong (1966).

(ঘ)

GREAT DICTATOR সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা ঃ

১৯৭২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভেনিসে অনুষ্ঠিত Chapline Retrospective-এ 'গ্রেট ডিক্টেটর' দেখার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। দর্শক, যাদের বেশির ভাগই ইতালিবাসী, ঘন ঘন হাততালি দিয়েছেন, হাসিতে ফেটে পড়েছেন, উল্লাসে মুখর হয়ে উঠেছেন এবং শেষ দৃশ্যে অবাক বিস্ময়ে শশকের মতো কান খাড়া করে শুনেছেন ডিক্টেটরবেশী ইহুদি নাপিতের দীর্ঘ বক্তৃতা।

আশ্চর্য, ছবিটি তৈরি হয়েছিল সেদিন থেকে বত্রিশ বছর আগে, অথচ সেদিনের দর্শক, ১৯৭২ সালের দর্শক, ছবিটিকে আপনার করে নিলেন কত সহজে, অনায়াসে। পরের দিন, মঁসিয়ে ভের্দু ছবি দেখতে গিয়েও একই জিনিস ঘটল। দর্শকের মনে হলো, এ যেন আজকের

কথা, মনে হলো বিদ্রূপের চাবুক যেন সোজাসুজি পড়ছে আজকের জগতের যুদ্ধবাজদের উপর।

গ্রেট ডিক্টেটর দেখতে গিয়ে একটা ভারি মজার জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। হিংকেলের মতো নাপালনি অর্থাৎ মুসোলিনিও এক বিশেষ জাতের সঙ হয়ে পর্দায় উপস্থাপিত হল, যার কাণ্ডকারখানায় সবাই প্রাণ ভরে হাসলেন, তাকে সাধারণ মানুষের এক নম্বর দুমশন হিসেবে প্রতি মুহূর্তে নাজেহাল হতে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ।

ছবির শেষে একজনের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক ইটালিয়ান, এক কৃতী সাংবাদিক। আমি বললাম ঃ এক সময়কার জাতির জনককে নিয়ে এত ঠাট্টা বিদ্রূপ হল, এত হেয় করা হল, ইটালির দর্শক বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিলেন এবং পৃথিবীর নানা দর্শকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চ্যাপলিনকে সাধুবাদ জানালেন। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য অথচ কি দারুণ ভাল। অন্য দেশে এরকম হবে বলে মনে হয় না।

ভদ্রলোক বললেন : ইটালিয়ানরা যে মুসোলিনিকে পছন্দ করে না তার একটা মস্ত কারণ কি জানেন? মুসোলিনি যুদ্ধে হেরে গেছে এতেই ওদের রাগ!